আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষড়বিংশ গ্রন্থ

সীমন্তিনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সোদর-প্রতিম শৈশব-সুহৃদ্

কাশীমবাজারাধিপতি,

অনারেবল্ মহারাজা

শ্রীযুক্ত সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী,

কে, সি, আই, ই.

ভাই মণি,

শীতাতপ বসন্ত বর্ষায় যে সুদীর্ঘ প্রবাস-পথ এতদিন একসঙ্গে অতিক্রম করিয়াছি, তাহা অবসানপ্রায়। অদূরে বৈতরণীর খেয়াঘাট, এখন পরস্পরে বিদায়-গ্রহণের দিন সন্নিকট। তাই, এই আসন্ন সন্ধ্যায় আমাদের সুদীর্ঘ প্রবাস-পর্য্যটনের সুখস্মৃতির উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা
১লা জ্যৈষ্ঠ
১৩২৫

প্রীতি-গুণ-মুগ্ধ
দেবেন
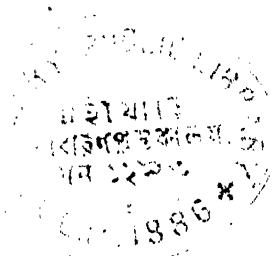
সীমন্তিনী

নব-বিবাহিতার কাহিনী

'বি—বা—হ! বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে, সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?'—

কথাটা ষোড়শী কপালকুণ্ডলা ভবানী-মন্দিরের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। অধিকারী এ প্রশ্নের ছাই উত্তরই বা দিবে কি, আর সাধারণ পুরুষজাতিই বা বিবাহের অর্থ বুঝ্‌বে কি? স্ত্রী-বিয়োগ হ'লে টোপর মাথায় দিয়ে যারা আবার বিবাহ কর্‌তে যায় —বিবাহ কি, তা'রা কি জান্‌বে? শ্রীরাম-চন্দ্র যে-সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, সেই

সীতা প্রার্থনা করেছিলেন—জন্ম-জন্ম যেন রামচন্দ্রকে স্বামিরূপে পাই। বুঝ, আমাদের পক্ষে বিবাহ কি, স্বামী কি!

আগে আমিও বুঝ্‌তুম না। আমার দু'টি পুতুল ছিল, একটার পা ভাঙ্গা, একটার মাথা কাটা। বাল্যকালে তাদের যখন বিবাহ দিতুম, তখন মনে কর্‌তুম, সত্যকার বিবাহও এমনি একটা খেলা, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে খেল্‌তে হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমার শুভদৃষ্টির সামনে একটি তরুণ, সুকুমার মন্মথ-মূর্ত্তির প্রকাশ হ'ল, সেই শুভক্ষণেই বুঝ্‌লুম, আমার নারীজন্ম, জীবন, যৌবন, শিবপূজা, সাধনা, সব সার্থক। এত দিন তুমি কোথায় ছিলে, হে রাজাধিরাজ! আমার হৃদয়-সিংহাসন যে, তোমারই জন্ত পেতে ব'সে আছি! পুরুষের শুভদৃষ্টিপাত না হ'লে নারীর

হৃদয়-বিকাশ হয় না। নারীর নারীত্বে বরং হয় বিবাহে।

কে বলে রূপ নইলে মন ভুলে না? যদি তোমার কাল-কুৎসিত পতিকে কন্দর্প হ'তেও সুন্দর না-দেখে থাক, জেনো, তোমার শুভ-দৃষ্টি হয় নাই। আমার বিবাহ-রাত্রিতে যিনি বরবেশে এসে আমার হৃদয়াকাশে উদিত হ'লেন, লোকে তাঁকে বলেছিল—কাল! শুনে, আমারও মন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় দেখ্‌লুম্‌,—কাল নয়, কাল নয়, সে পরম সুন্দর! সে সৌন্দর্য্য বুঝাবার মত ভাষা আমার নাই। যার জন্য জীবন, যৌবন, সংসার, সব সুন্দর—যার জন্য আমি সুন্দর, সে কত সুন্দর, কেমন ক'রে বুঝাব? যার সোহাগ-আদর, উপেক্ষা-অনাদর, সব সুন্দর—সে কত সুন্দর, কেমন ক'রে

বুঝাব? কা'র সঙ্গে, কিসের সঙ্গে তা'র তুলনা দিব? তেমন প্রেমময় চক্ষু, তেমন মনোমোহন কটাক্ষ আর কা'র আছে? আমার কথায় কারুর যদি অবিশ্বাস হয়, আমার চোখ দিয়ে দেখ। সে কাল নয়, পরম সুন্দর! আমার সাতরাজার-ধন, সাগর-ছেঁচা মাণিক! বুঝ্‌লুম, বিধাতা কাঙালিনীকে রত্ন দিয়েছেন; এখন এত সুখ আমার সইলে হয়—এ যে দুঃখের কপাল!

অতি অল্প বয়সে আমি পিতৃহীন হই। আমার বেশ মনে পড়ে, সেদিন দেখেছিলুম, মায়ের চক্ষু যেন জবাফুলের মত লাল; চুল-গুলি আলুথালু, মুখখানি প্রভাতের চাঁদের মত ম্লান। তিনি আমার হাত ধ'রে বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বাবা আমায় একবার দেখে চোখ বুজ্‌লেন। কি সর্ব্বনাশ হ'ল,

নব-বিবাহিতার কাহিনী

তখন আমার বোঝ্‌বার বয়স নয়; কিন্তু শুন্‌লুম, মা একটু উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ব'লে উঠ্‌লেন—'সৎ—সৎ—সৎ !'

সে সময় আমাদের বাড়ীতে যারা ছিল, তা'রা অমনি ছুটে এসে জোড়হাত ক'রে দরজার কাছে দাঁড়াল। তারপর চুপি-চুপি সকলে কি বলাবলি কর্‌লে। খানিকপরে কেউ লাল চেলী আন্‌লে, কেউ সিঁদুর, কেউ ফুলের মালা। পাড়ার বধূরা এসে অঞ্চলে চক্ষু মুছ্‌তে-মুছ্‌তে মাকে সাজাতে লাগ্‌ল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে মায়ের মুখ দেখেছিলুম ছিন্ন-ভিন্ন, শ্রীহীন পদ্মের মত, এখন দেখি যেন জল্‌জল্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। আমি তাঁর কাছে যেতে চাইলুম, কিন্তু ঝি আমায় ছেড়ে দিলে না।

প্রতিবেশী-বধূরা কেউ সযত্নে মায়ের শুভ্র

ললাটে শ্বেত-চন্দন মাখিয়ে রক্ত-চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলে; কেউ ফুলের মালা, কেউ আলতা পরালে; সীমন্তভ'রে সিঁদূর দিলে। মায়ের মুখখানি যেন নব-বধূর মত ঢল-ঢল করতে লাগল। তারপর বাবাকে একখানি খাটের উপর শুইয়ে দশ-পনের জন লোকে খই-কড়ি ছড়াতে-ছড়াতে, সঙ্কীর্ত্তন করতে-করতে ব'য়ে নিয়ে চল্‌ল। মা লাল চেলী প'রে, পূর্ণঘট ও আম্র-শাখা হাতে ক'রে পিছনে-পিছনে যেতে লাগলেন। বাবা চল্‌লেন, মা চল্‌লেন, আমায় কেউ ডাকলেন না। মনের ভিতর কেমন করতে লাগল। ঝিয়ের কোল থেকে নেমে প'ড়ে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচল ধর্‌লুম। তিনি ফিরেও চাইলেন না, আমাকে আস্তে-আস্তে ঠেলে দিলেন। ঝি তাড়াতাড়ি এসে আমায় কোলে তু'লে নিলে।

নব-বিবাহিতার কাহিনী

পুরুষমানুষেরা হরিধ্বনি করছে; স্ত্রী-লোকেরা হুলুধ্বনি দিচ্ছে; কেউ মায়ের পথে অঞ্জলি-অঞ্জলি ফুল ছড়াচ্ছে। একটি স্ত্রীলোক কোথাথেকে ছুটে এসে মায়ের পায়ের কাছে একটি কঙ্কালসার শিশুকে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, 'একবার প্রসন্ন-দৃষ্টিতে চাও মা।' একজন বল্‌লে, 'মা, আমি জন্মান্ধ, একবার আমার চোখে তোমার পদ্ম-হস্ত বুলিয়ে দাও, আমি দেখি—তোমার পা দু'খানি দেখি!' কেউ তাঁর সামনে লুটিয়ে প'ড়ে পায়ের ধুল নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌তে লাগ্‌ল, কেউ তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে, কুড়িয়ে নিয়ে, মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধ্‌লে। আজ আমার মা যেন জগতের মা, আমার কেউ নয়, আমিও তাঁর কেউ নই! নিতান্ত পরের মত এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ঝিয়ের সঙ্গে চল্‌লুম—নদীতীরে।

সেখানে কোথা হ'তে এক সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত। সকলে চুপি-চুপি বলাবলি করতে লাগল—'পাদ্রী সায়েব, পাদ্রী সায়েব। একটা গোল বাধাবে দেখ্‌ছি।'

সাহেব ভিড় ঠেলে মায়ের সামনে গিয়ে টুপি খুলে সেলাম দিলেন। তারপর মাকে বোঝাতে লাগ্‌লেন—আত্মহত্যা পাপ, এমনি কত কথা।

মা বল্‌লেন, 'সায়েব, আমি ত মরেই গিছি।' তারপর বাবার মৃতদেহ দেখিয়ে বল্‌লেন, 'এঁর সঙ্গে আমার জীবন চ'লে গিয়েছে। প'ড়ে আছে কেবল হাড়-মাসের খাঁচা। তুমি এসে আমার নাড়ী দেখ, যদি জীবনের কোন লক্ষণ পাও, আমি আর আগুনে পুড়্‌ব না।' পাদ্রী সাহেব মায়ের

নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেদিকে কোন উপায় নাই দেখে সাহেব অবশেষে সন্ধান নিলেন, মায়ের কে আছে। শুন্‌লেন, একটি ছোট মেয়ে। কই? ঐ যে! সাহেব অমনি ঝিয়ের কোল থেকে আমায় নিয়ে গিয়ে মাকে বল্‌লেন, 'মায়ি, তুমি চলিলে, ইহাকে কে দেখিবে?'

মা অলক্ত-রঞ্জিত একটি আঙুল তুলে ঊর্দ্ধদেশ দেখিয়ে দিলেন। তখন পাদ্রী বল্‌লেন, 'মায়ি, ইহাকে তবে আমাকে দাও। আমি আপন কন্যার সমান পালন করিব। ইহাকে লেখাপড়া শিখাইব।'

আমাকে খ্রীষ্টান কর্‌বে, এই ভয়ে মায়ের মুখের উপর একটা আতঙ্কের ছায়া পড়্‌ল।

তিনি চারদিক্ চেয়ে জ্যেঠাইমাকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, 'দিদি—!'

জ্যেঠামশায় অমনি এগিয়ে এসে বল্‌লেন, 'ছোট-বৌমা, খুকীকে আমার কাছে দিয়ে যাও।' জ্যেঠাইমা আমায় কোলে তুলে নিলেন, মায়ের মুখ আবার প্রসন্ন হ'ল।

তারপর পাদ্‌রী সাহেব সেখানকার সব সমাগত লোকদের বল্‌লেন, 'একটি জীবন্ত স্ত্রীলোক আগুনে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে-করিতে মরিবে, আর তোমরা সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য উদাসীন চক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিবে? তোমরা সব মানুষ, না পশু! জানো, আইনে তোমরা দণ্ডনীয়।'

শ্মশানে একটি ঘৃত-পূর্ণ প্রদীপ জ্বল্‌ছিল, মা তা'র শিখায় আপনার কনিষ্ঠাঙ্গুলীটি ধর্‌লেন। আঙুল জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। সকলের

মুখ ভয়ে বিবর্ণ, কেবল যাঁর আঙুল পুড়্‌ছে, তাঁর মুখ প্রসন্ন, হাস্যময়! সাহেবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, 'সায়েব, এক জন্ম নয়, তিন জন্ম আমি এঁর সঙ্গে পুড়্‌ছি।'

সাহেব তখন গুম্ হয়ে ঘোড়ায় চড়্‌বার জন্যে চল্‌লেন। কিন্তু পাছে তিনি ফাঁড়ীতে গিয়ে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করেন, এই ভয়ে গ্রামবাসীরা তাঁর ঘোড়াটি সরিয়েছিল। ফাঁড়ী অনেক দূর, পদব্রজে সেখানে পৌঁছুতে এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।

সাহেব হেঁটেই চ'লে গেলেন। কিন্তু তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখে মায়ের ভয় হয়েছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, 'এ হিঁদুর দেশে কি এমন কেউ নাই যে, সতীর ধর্ম্মপালনে সহায়তা করে?'

তখন আমাদের দেশের জমীদার যাকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন, 'কি হুকুম কর, মা ?'

মা বল্‌লেন, 'বাবা, আমার কাজে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যেন না কোন বিপদে পড়েন এই আমার ভিক্ষা।'

জমীদার তখন সকলকে লক্ষ্য ক'রে, বল্‌লেন, 'আমাকে চেন কি ? ঐ খৃষ্টান ছাড়া পুলিশ যদি কারুর কাছে এ ঘটনার কোন সংবাদ পায়, আমি সাতখানা গ্রাম পোড়াব। সকলে হরিধ্বনি কর।'

যেন কে জাঙ্গাল ভেঙে দিলে! গগন-ভেদী হরিধ্বনি উঠ্‌ল!—'জয় সতীমায়ের জয়!' মা বাবার পাশে চিতা-শয্যায় শয়ন কর্‌লেন। সতীদেহ-স্পর্শের উল্লাসে পাবক যেন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। জ্যেঠাইমা আমায় কোলে নিয়ে ছুটে পালালেন।

সেই অবধি আমি জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে। পিতার সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল কি না, জানি না। তবে একখানি বাড়ী ছিল আর মায়ের অনেকগুলি গহনা ছিল। সেগুলি সব একে-একে জ্যেঠামশাই বিক্রয় ক'রে ফেল্‌লেন। গয়নাগুলি বেচ্‌বার সময় জ্যেঠাইমা বলেছিলেন, 'ছোট বউ ওগুলি খুকীর বে'র জন্যে দিয়ে গেছ্‌লেন।' জ্যেঠামশায় তা'র উত্তর দিলেন, 'রোজগার ত কাউকে কর্‌তে হয় না, কেবল্‌ ব'সে-ব'সে কাঁড়ি-কাঁড়ি গেলো। ঐ হাভী-মেয়ের খোরাক আস্‌বে কোথেকে? ঐ টাকা ওরই নামে জমা রইল। সুদ আস্‌বে, খাবে। আমি কি গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ভাইঝির পিণ্ডি যোগাব না কি?'

সত্যই আমায় সেই সুদ খেয়ে থাক্‌তে

হ'ত। দু'বেলার এক বেলাও আমার ভাল ক'রে পেট ভরৃত না। এক-একদিন দুবেলাও জুট্‌ত না। বোধ করি, সেদিন সুদ আস্‌ত না। তবে যেদিন সুদ বন্ধ হ'ত, সেদিন যে কেবল আমারই সুদ বন্ধ হ'ত, এমন নয়, বাড়ীসুদ্ধ সকলের,—অর্থাৎ, এই হতভাগিনীর, জ্যেঠাইমার, তাঁর পুত্রের আর জ্যেঠামশায়ের নিজেরও। কেবল ঝি-চাকরদের সুদ বন্ধ হ'তে কখন দেখিনি, কেননা, জ্যেঠামশায়ের সংসারে সে-সব বালাই কিছু ছিল না। সুতরাং, তাদের মনিব-বাড়ী তা'রা পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচ্‌ত।

জ্যেঠামশায়ের আকার ও আহার দু-ই একপ্রকার ছিল—চামচিকার মত! বাস্তবিক এত অল্প আহারে যে কি ক'রে মানুষ বাঁচ্‌তে পারে, তা আমি এখনও বুঝ্‌তে পারিনি!

বোধ করি, জ্যেঠামশায় সে সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা সত্য। তিনি বল্‌তেন, 'খাওয়াটা জীবনের যেমন উদ্দেশ্য নয়, তেমনি আবশ্যকও নয়। যোগীরা বাঁচে কেমন ক'রে? ওটা অভ্যাসমাত্র। বেশী খাওয়াটা ত একেবারেই বদ্-অভ্যাস। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে'—ইত্যাদি। পাছে কেউ বদ্-অভ্যাস ক'রে ফেলে, তাই জ্যেঠামশায় ভাঁড়ারের চাবি তাঁর নিজের হাতে রাখ্‌তেন। নিজে চাল-ডাল সব বের ক'রে দিতেন। আমি আসাতে জ্যেঠাইমা চাল ডাল বেশী ক'রে চাইলেন। জ্যেঠামশায় তা'র পরিবর্ত্তে উক্ত উপদেশগুলি দিলেন। সংসারে লোক বাড়্‌ল, কিন্তু চাল-ডালের খরচ সমান রইল।

জ্যেঠামশায়ের পুত্রটি আমার চেয়ে অনেক

বড়। তা'র তখন খাবার বয়স। কিন্তু দেখ্‌তুম, সে যত না ভাত খেত, মার খেত তা'র চেয়ে অনেক বেশী। আর সে একেবারে চোরের মার। সেও সত্য-সত্যই চোর ছিল। কিন্তু আমি তা'র মার দেখে ডাক-ছেড়ে কাঁদ্‌তুম্ শেষে সে-ই এসে আমায় ভোলাত।

সে যে কি সোনার চক্ষে আমায় দেখে-ছিল, বল্‌তে পারি না। তা'র সেই আধ-পেটা ভাত সে দু'গ্রাসমাত্র খেয়ে আমাকে খাওয়াত, তাইতে আমি বেঁচেছিলুম। শুনেছি, সে পেটভ'রে খেতে পেত না ব'লে চোর হ'য়ে-ছিল। আমি তা'কে দাদা ব'লে ডাক্‌লে সে স্বর্গ হাতে পেত! ক্রমে সে বেত খেলে, জেল খাটলে, বাড়ী থেকে তাড়িত হ'ল। কিন্তু আমার প্রতি তা'র অকৃত্রিম স্নেহ একতিল কম্‌ল না।

সে নিত্য লুকিয়ে এসে আমায় দেখে যেত। ধর্‌তে পার্‌লে জ্যেঠামশায় তা'কে মার্‌তেন। জ্যেঠাইমা যদি কখন তা'কে চুপি-চুপি ডেকে খাওয়াতেন, জ্যেঠামশায় তা টের পেলে আর তাঁর রক্ষা থাকৃত না। প্রথম, গালের স্রোত দু'কূল ছাপিয়ে চল্‌ত, তারপর, শ্বশুরকুল পিতৃকুল পরিতৃপ্ত হ'লে, জ্যেঠামশায় জ্যেঠাইমাকে প্রহার আরম্ভ কর্‌তেন। সে মার যদি জ্যেঠাইমাকে সব খেতে হ'ত, তাহ'লে আর তিনি বাঁচ্‌তেন না। আমার চোর ভাইটি তার মাকে সাম্‌লে সমস্ত মার নিজের শরীরে নিত। তখন তা'র উদয়মুখ যৌবন, গায়ে হাতীর বল, জ্যেঠামশায়ের উপর যদি সে অত্যাচার কর্‌ত, বোধ করি, হাতীর কাছে চাম্‌চিকার যে দুর্দ্দশা হয়, জ্যেঠামশায়েরও

তাই হ'ত; কিন্তু বাপের গায়ে সে হাত তুল্‌ত না।

অবশেষে সব অত্যাচার নিবারণ এবং সকল দিক বজায় রাখ্‌বার জন্য দাদা এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন কর্‌লে। বাড়ীতে আর সুধু হাতে আস্‌ত না; লাউটা, কুম্‌ড়টা, একটা-না-একটা কিছু আন্‌ত। কোথা থেকে আন্‌ত, জ্যেঠামশায় তার কোন খোঁজ কর্‌তেন না। বোধ করি, ভাব্‌তেন, পচা পুকুরের পাঁক না ঘেঁটকানই ভাল। যা'ই হ'ক, যেদিন কিছু না আন্‌ত, সেই দিনই বিপদ।

সে মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য কর্‌ত, কেবল এক লহমা আমাকে দেখ্‌বার জন্য। এ-কে কি না-ভালবেসে থাকা যায়? বাপ, মা, ভাই, বোন, কেউ ছিল না, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে স্নেহের বান ডাকৃত, সে কেবল

এই চোর ভাইটির জন্য। মেঘ কি কাঁটা-বনের উপর বর্ষণ করে না?

জ্যেঠামশায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার বয়স বাড়্‌তে লাগ্‌ল। চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পড়্‌লুম। বর আর ষোটে না। যত সম্বন্ধ আসে, জ্যেঠামশায় একটা-না-একটা উপায় ক'রে ভেঙে দেন। তাঁর দারুণ ভয়, আমার বিবাহ হ'লে শ্বশুরবাড়ীর তাড়নায় আমার বাড়ী ও গহনা বেচার টাকাগুলি সব ওগ্‌রাতে হবে। তার উপর তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, আমি তাঁদের হাত-ছাড়া না-হয়ে যাই। সে-যে আমার উপর মমতায়, তা নয়। তেমন মহাপাপ তিনি কখন করেন নি। বিনাবেতনে একাধারে এমন ঝি রাঁধুনী আর কোথায় পাবেন? আমি রাঁধি, বাসন মাজি, সংসারের অন্য কাজ-কর্ম্ম

করি। জ্যেঠাইমা সূতাকাটা প্রভৃতি এমন সব কাজ করেন, যা'তে দু'পয়সা লাভ হয়। একটু অবসর ক'রে যে, তিনি আমায় সাহায্য কর্‌বেন, কিছুতেই তা পার্‌তেন না। সে সাধ্য তাঁর ছিল না। জ্যেঠামশায়ের দৃষ্টি ছিল অতি তীক্ষ্ণ।

যে সম্বন্ধ আস্‌ত, জ্যেঠামশায় একটা অসম্ভব দর হেঁকে বস্‌তেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যদি একান্তই আমায় ছাড়্‌তে হয়, আমার ওজনে টাকা পেলে তবে ছাড়্‌বেন। বোধ করি, স্বয়ং যম এসেও তাঁকে প্রতিজ্ঞা হ'তে টলাতে পার্‌তেন না। কিন্তু এত ক'রেও তিনি আমায় রাখ্‌তে পার্‌লেন না। আমার বিবাহ হ'ল! ভবিতব্য!

আমাদের গ্রামের বহুদূরে একঘর বড়-মানুষ ছিলেন। তাঁদের একমাত্র বংশধর এত

দিন কল্‌কেতায় থেকে লেখাপড়া শিখ্‌ছিলেন। এ-দেশে ইংরাজী-শিক্ষার তখন ভারি ধুম! আমাদের গাঁয়ের জগা ময়রার ছেলে, দোকানে সন্দেশের ওপর মাছি বস্‌লেই তা'র বাপকে চেঁচিয়ে বল্‌ত—'বাবা, এ ফ্লাই—এক মাছি'! যাক্‌ সে কথা।

সেই বড়-লোকের ছেলে পড়া-শুনা শেষ ক'রে দেশে এলে, কবে, কখন্‌, কোথায় যে আমি তাঁর নিশীথ-নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে-ছিলুম, তা তিনিই জানেন। বাবুটি, বোধ করি, একটু রোমান্টিক্‌! কথাটা আমা'র তাঁরই কাছে শেখা। আবার ইংরাজী-শিক্ষিত ব'লে বয়স্থা-কন্যা বিবাহ ক'রে সমাজকে উন্নতির আদর্শ দেবার জন্য তাঁর বিশেষ উৎসাহ। তা'র উপর তিনি যখন শুন্‌লেন, আমার মা 'সতী' হয়েছিলেন, তখন

আমাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তাঁ'তে উন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ হ'তে লাগ্‌ল। তাঁরও বাপ-মা ছিলেন না, সংসারের কর্ত্রী একমাত্র পিসীমা। বাবুটি তাঁর কাছে বায়না নিয়ে, তাঁকে ভয় দেখিয়ে, জ্যেঠামশায়ের থাঁই মিটিয়ে, আমাকে কিনে নিয়ে গেলেন। অধর্ম্ম-কথা কইব না, জ্যেঠামশায় আমাকে দু'গাছি রুলী যৌতুক দিয়েছিলেন!

বিবাহ হ'য়ে গেল। যে-রত্ন লাভ করেছি, তা'র আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তবু এতদিনের আশ্রয়, স্নেহময়ী জ্যেঠাইমাকে আর সেই চোর ভাইটিকে ছেড়ে যেতে আমার বড় মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল। জ্যেঠাইমা আমার হাত ধ'রে গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, 'ছি, মা, কেঁদ না! আজ তোমার এই যন্ত্রণার জেল থেকে মুক্তি হ'ল।

মরণ বই আমার আর নিষ্কৃতি নেই। মা, তুমি জানো, আমি বড় দুঃখিনী। মেয়েমানুষ পতি-পুত্তুর নিয়ে সুখী, আমার সেই দু'টিই দুঃখের মূল। ছোট বউ তাঁর কোল থেকে তোমাকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি মনের মতন যত্ন ক'রে তোমায় মানুষ কর্‌তে পারি নি। কেন পারি নি, তুমি এখন বড় হয়েছ, জানো। তোমাকে জোর ক'রে কোন কথা বল্‌বার আমার দাবী নেই। তবু একটা কথা বলি—রাখ্‌বে কি, মা?"

আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে জ্যেঠাইমার বুকে মুখ রেখে কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে বল্‌লুম, 'মা, আমি যে তোমাকেই মা ব'লে জানি।'

জ্যেঠাইমা আমাকে আরও জোর ক'রে বুকে চেপে ধ'রে বল্‌লেন, 'আমি, মা, তোমায়

ভাল রকম জানি ব'লেই কথাটা বল্‌তে সাহস কর্‌ছি। মা, স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে কেউ নেই। স্বামী দেবতা। দেবতা সদয় হোন্‌, নির্দ্দয় হোন্‌, সে তাঁর ইচ্ছা। আমার কাজ, তাঁকে পূজা করা। আমি, মা, এই কথাটি মনে ক'রে এ-বাড়ীতে দিন কাটাই। যে-পায়ের লাথি খাই, নিত্য সেই পা ধুইয়ে জল পান করি; সেই পায় হাত বুলিয়ে দি। তুমি আজ তোমার ইষ্টদেবতার আশ্রয় পেয়েছ। স্বামীর কাছে মনের কথা লুকুতে যে কি হয়, তা আমি জানি! তবু, মা, আমার একটা কথা রেখ।'

'কি, মা? আমায় এত ক'রে বলছ কেন? কি কথা, বল না।'

'মা, সন্তানের কুচরিত্রের কথা বল্‌তে হ'লে লজ্জায় মুখে বাধে। সন্তানের নিন্দা-

অখ্যাতে যে, মনে কি হয়, তা মা হ'লে বুঝ্‌বে! আমার একদণ্ড সোয়াস্তি নেই। রাত্রে ঘুমুই, থেকে-থেকে চম্‌কে উঠি। মনে হয়, হয় ত সে কোথায় চোরের মার খাচ্ছে! মা, স্বামি-নিন্দা কর্‌তে নেই, আমার কপাল-দোষে ছেলে চোর! কিন্তু কুটুম-বাড়ীতে, জামায়ের কাছে এ-কথা প্রকাশ হ'লে আমার বড় মনস্তাপ হবে। তুমি, মা, আমার গা ছুঁয়ে বল, আমার ছেলে আছে, তোমার সে ভাই, এ-সব কথা কখনও প্রকাশ কর্‌বে না? মা, আমার জামায়ের কাছে তোমার এ-কথা লুকুতে যদি কোন পাপ হয়, তা আমার।'

আমি জ্যেঠাইমাকে কথা দিলুম। সেই সময় দাদা কোথা থেকে ফুলের মালা, ফুলের গহনা এনে জ্যেঠাইমাকে বল্‌লে, 'ওকে পরিয়ে দে, আমি কিনে এনেছি।'

জ্যেঠাইমা যত্ন ক'রে আমাকে সেগুলি পরাতে-পরাতে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, ছোট বউয়ের একগা গয়না ছিল—'

আমি আর তাঁকে বলতে দিলুম না। তাঁর মুখ চেপে ধ'রে বল্লুম, 'সে-সব দাদার বৌ এসে পরবে।'

তারপর দাদাকে বল্লুম, 'দাদা, জ্যেঠাইমা বারণ করছেন, তুমি আমার শ্বশুর-বাড়ীতে কখন যেয়ো না।'

দাদার মুখখানা কেমন হয়ে গেল! খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্লে, 'আচ্ছা। কিন্তু তোকে যখন দেখ্‌তে ইচ্ছে হবে, লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে আস্‌ব।'

এ-কথায় আমি আর কি বল্‌ব? কিন্তু আমার মনে ভয় হ'ল। শুনেছি, আমার শ্বশুরেরা বড়-লোক। সেখানে যাবে, কবে

কি লোভে পড়্‌বে, কথাটা বেশী ক'রে ভাব্‌তেও আমার সাহস হ'ল না।

আমাকে বিষণ্ণ ও চিন্তিত দেখে দাদা বল্‌লে, 'তুই মনে দুঃখ করিস্ নি, আমাকে যেতে বারণ কর্‌তে তোর মনে ক্লেশ হয়েছে। তুই জানিস্ ত, ভাই, আমার স্বভাব। আজ আমার দুঃখ হচ্ছে, কেন এমন হলুম! জামাই-বাবুর সামনে বেরুতে পেলুম না!' কিন্তু তখনি সে মনের দুঃখ চেপে নিলে, ফোঁস্ ক'রে একটা নিশ্বাস পড়্‌ল, আমি বুঝ্‌লুম। ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, 'মা, শালার কাণ মল্‌বার জন্তে আমার হাত গুড়্‌গুড় কর্‌ছে। তুই অমন প্যাঁচা-মুখ ক'রে ব'সে আছিস্ কেন?'

এ-কথার উত্তর আমি আর কি দেব? জ্যেঠাইমা বল্‌লেন, 'ওর বে ব'লে কি ও

নেচে বেড়াবে না কি? সবার চেয়ে আজ ওরই বেশী লজ্জা।'

'কেন, মা, ও ত কারুর কিছু চুরি করে নি যে, লজ্জা হবে।' কথাটা বলেই দাদা আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস্ ফেল্‌লে। তারপর আমায় বল্‌লে, 'শোন্, আমাকে দেখ্‌বার জন্যে তোর মন কেমন কর্‌বে। আমি তা'র উপায় করেছি। তোর শ্বশুর-বাড়ীর দক্ষিণে একটা মস্ত মাঠ আছে আর একটা অশথ্‌গাছ আছে—জান্‌লা দিয়ে দেখা যায়। আমি মাঝে-মাঝে বিকেলে গিয়ে সেই গাছতলায় ব'সে থাক্‌ব। তুই জান্‌লায় দাঁড়ালেই আমায় দেখ্‌তে পাবি।'

হায়, ভাই-বোনে দেখা কর্‌ব, তার এত ফন্দি-ফিকির, লুকোচুরি! আপাততঃ সেই কথাই রইল।

ফুল প'রে জ্যেঠামশায়কে প্রণাম কর্‌তে গেলুম। তিনি ত চ'টেই আগুন! বল্‌লেন, 'তুই আবার এ সব ফুল পেলি কোথা? আজ-কাল্‌কার ছেলেরা সাজ-গোজ, গয়না-পরা পছন্দ করে না। এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে?'

ভয়ে, লজ্জায় আমি মৃতপ্রায় হ'য়ে গেলুম। আমার অবস্থা দেখে দাদা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'ও সব আমি যোগাড় ক'রে এনেছি, ওর দোষ নেই।'

যোগাড়ের অর্থ জ্যেঠামশায় বিলক্ষণ বুঝ্‌তেন। বল্‌লেন, 'এ সব বাজে-জিনিসের চেয়ে তরকারি-পাতি যোগাড় কর্‌লে সংসা-রের উপকার হয়।'

বাপের দৌরাত্ম্যেই ত দাদার স্বভাব এমন বিগ্‌ড়েছে! যা-হ'ক, জ্যেঠামশায়কে প্রণাম

ক'রে, জ্যেঠাইমার পায়ের ধূল মাথায় ধ'রে আমি নূতন সঙ্গী নিয়ে, নূতন স্থানে, নূতন সংসার পাত্‌বার জন্য যাত্রা কর্‌লুম। স্নিগ্ধ, শ্যাম-ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথে পদার্পণ ক'রে মনে হ'ল, এ যেন সে চির-পরিচিত পথ নয়, আমার সামনে যেন সুদীর্ঘ সংসারের পথ প'ড়ে রয়েছে! কে জানে, কোথায় এর শেষ! এ পথ কি নিষ্কণ্টক, না বিঘ্নসঙ্কুল? যা'ই হ'ক, পথে যদি কাঁটা থাকে, আমার স্বামীর পায়ে তা ফুট্‌তে দেব না। পারি, পথ থেকে তুলে নেব, নয়, বুক পেতে দেব।

আমার বিবাহে বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী কেউ ছিল না। আত্মীয়-স্বজন, কেউ যে নিমন্ত্রিত হয় নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। স্বামী আমার হাত ধ'রে পাল্‌কীতে তুলে দিলেন আর সেই সময় আমার কাণে-কাণে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী, না মর্ত্ত্যের ফুলরাণী?' আমার সর্ব্বশরীর সোহাগে, পুলকে কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। জ্যেঠামশায়ের কথায় যে ভয় পেয়েছিলুম, তা দূর হ'ল। কিন্তু লজ্জায় মুখে কথা সরল না। মনে-মনে বললুম, 'আমি তোমার দাসী।'

নায়কের কাহিনী

আমার বয়স বাইশ, তাহার ষোল; এক বৎসর হইল, আমাদের বিবাহ হইয়াছে।

বিবাহের পর যখন প্রথম প্রণয়-মোহে মন অভিভূত হয়, সে-অবস্থা বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। সে আগ্রহের মিলন, মিলনে অতৃপ্তি; সে দূরে-দূরে বাহুপ্রসারণ, শূন্যে-শূন্যে আলিঙ্গন; চোখে-চোখে কথা, চুরি ক'রে হাসি; সে স্পর্শের মাদকতা বুঝাইবার ভাষা কোথায়?

লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলিত। কথাটা শ্লেষ হইলেও সত্য এবং আমি উহা স্তুতি-স্বরূপ গ্রহণ করিতাম।

কলিকাতায় লেখাপড়া শেষ করিয়া আমি

দেশে আসিলাম। উপার্জ্জনের প্রয়োজন ছিল না; পল্লীগ্রামে নিশ্চেষ্ট জীবন কতক অধ্যয়ন করিয়া, কতক মৎস্য ধরিয়া কাটাইতাম।

একদিন আমাদের গ্রামের বহুদূরে এক পুকুরে মাছ ধরিতে যাই। পুষ্করিণীটী, বোধ হয়, নিরামিষ। সারাদিন বসিয়া-বসিয়া উঠিব মনে করিতেছি, সহসা নীরব সন্ধ্যা মুখরিত করিয়া বালিকাসুলভ কলহাস্য উঠিল। আমি চকিতে পরপারের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, যার সে হাসি—সে কিশোরী। মাছ ধরিতে আসিয়াছিলাম, ধরা পড়িলাম—আমি।

সন্ধানে জানিলাম, সে সুহাসিনী অবিবাহিতা; তাহার জ্যেঠতাতের বাড়ীতে অনাদরে প্রতিপালিতা। তাহার পিতা-মাতা কেহই ছিল না। মাতা 'সতী' হইয়াছিলেন। আমারও

৩৩

পিতা-মাতা ছিলেন না, সংসারের কর্ত্রী—মাসীমা। বয়স্থা কন্যা হইলেও নির্ব্বিঘ্নে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

যে পরিমাণ অর্থে পরিমিতব্যয়ী মানুষ সুখে থাকিতে পারে; যতটুকু বিদ্যা থাকিলে মূর্খ-অভিধান হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, অথচ মনে পাণ্ডিত্যের অভিমান জন্মে না, ততটুকু আমার আয়ত্তে ছিল। তা'র উপর এই সুহাসিনী, কিশোরী জায়া লাভ করিয়া মানব-জীবনের নশ্বরতা বা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিবার জন্য আমার কোনরূপ ব্যস্ততা ছিল না। সুতরাং, সন্ধ্যার পর বেদান্তের পরিবর্ত্তে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতাম। আমার স্ত্রী সেতারে সুর দিতেন, আমি গাইতাম, বিধাতা আমায় সুকণ্ঠ করিয়াছিলেন।

সেতারে আমার স্ত্রী সুদক্ষ ছিলেন না।

সঙ্গে সুর দিতে আর একখানিমাত্র গীত বাজাইতে পারিতেন—'জনম্-জনম্ হাম্ রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' আমি যখন তাঁহার মুখ চাহিয়া এই গীতটী গাইতাম, বোধ করি, তাঁহারও হৃদয়ের কোন তারে ঝঙ্কার উঠিত; কণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে না-পারিয়া সেতারে বাজাইতে শিখিয়াছিলেন।

ত্রুটিহীন মানুষ হয় না, কিন্তু আমার সকল অভাব স্ত্রী মনে-মনে পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমার রূপ ছিল না, অথচ তাঁহার দৃষ্টিতে আমি সাক্ষাৎ কুমার; পাণ্ডিত্যে চাণক্য; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। এক-কথায় আমি একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। পাচিকা যখন দুধ জ্বাল দিত, সে-সময় স্ত্রীকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যাইতে দেখিলে আমি যদি বলিতাম, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ,

বল্‌ব? লুকিয়ে আমার দুধে জল মিশুচ্ছে কি না তাই দেখ্‌তে।' তিনি অমনি দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, কিশলয়-কোমল হস্তে আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, 'চুপ্‌, চুপ্‌, তুমি নিশ্চয় জান্‌!' সে হস্তের স্পর্শে আমার দেহ, মন, প্রাণ, অস্থি, মজ্জা, শোণিত, সব শিহরিয়া উঠিত—শীতল-শীকর-সম্পৃক্ত সমীর-স্পর্শে কদম্ব-কানন যেমন কণ্টকিত হইয়া উঠে!

এই বালিকা-স্ত্রী সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেন, যেন কত কালের পাকা গৃহিণী। আমি তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিতেন, 'ফুলকে কি ফুট্‌তে ব'লে দিতে হয়, না সাপকে ফণা ধর্‌তে শেখাতে হয়?'

আমি চিরকালই এলোমেলো, অগোছ। জুতাযোড়াটা প্রায়ই পড়িয়া থাকিত তেতলার ছাদে; ছড়িগাছটা কখন খিড়্‌কীতে, কখন দেউড়ীতে; চাদরখানা কখন কুমড়ার মাচায়, কখন একটা ভাঙ্গা দাঁড়ে; আর জামাটা— আমার গায়ের সঙ্গে তা'র অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও, কখন্ যে কোথায় থাকিত, তাহার ঠিক ছিল না। এক-কথায় আমি যেখানে থাকিতাম—তাহাদের কেহই সেখানে থাকিত না। অথচ, এখন দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই ভালমানুষের মত আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

মাসীমা সংসার এবং আমাকে এই বালিকা গৃহিণীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিতে লাগিলেন।

দেশে আসিয়া অবধি আমি আর

কলিকাতায় যাই নাই। দীর্ঘকাল অদর্শনে বন্ধুবর্গের পরিহাস এবং শ্লেষ-বাক্যে অতিষ্ঠ হইয়া আমার স্ত্রী একদিন জেদ্ করিয়া আমায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। আমি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া চলিলাম।

আমাদের দেশ হইতে কলিকাতায় আসিবার পথ দুর্গম না হইলেও সহজ নহে। প্রথম কিছুদূর পাল্‌কীতে আসিতে হয়, তারপর নৌকায়। সহরে পৌঁছিতে প্রায় এক জোয়ার লাগে। উজাইয়া যাইতে হইলে অন্ততঃ দ্বিগুণ সময়ের প্রয়োজন। আমি সময় মাপ করিয়া পাল্‌কীতে উঠিয়াছিলাম। পথে নানা কারণে বিলম্ব হওয়ায় জোয়ার বহিয়া গেল। উজানে যাইলে সেদিন আর ডাক্-গাড়ী পাওয়া যায় না। বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বাটী ফিরিলাম।

যখন বাড়ী পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা। এই সময় স্ত্রী খিড়্‌কীর বাগানে বসিয়া আমার জন্য মালা গাঁথিতেন! যেদিন আমি উপস্থিত থাকিতাম না, আমার একখানি ছোট তৈলচিত্র সেই মালায় সজ্জিত হইত। আমি আসিয়াই উদ্যানাভিমুখে চলিলাম।

কি সুন্দর! সেদিন, বোধ করি, পূর্ণিমা। নারিকেল-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে অরুণ-কুঙ্কুম-লিপ্ত পূর্ণ শশধর প্রসন্নহাস্য বর্ষণ করিতেছেন। জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, তরু-লতা, ফুল-পাতা, সে-হাসিতে সবই হাসিতেছে! আমার সেই নিত্যদৃষ্ট উদ্যানখানি আজ কৌমুদী-গঠিত কাম্যবন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। হায়, এই ভূস্বর্গ ছাড়িয়া যাইতেছিলাম—ধূলি-ধূম-ধূসর কলিকাতায়!

উদ্যানে আসিয়া আমার মনে হইল, স্ত্রীর

সম্মুখে আচম্বিতে, অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিব। খুব সংযতভাবে, নিঃশব্দে, বৃক্ষের অন্তরালে-অন্তরালে, অলক্ষিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কৌতুকে, আগ্রহে, উৎসাহে, আমার দেহমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সহসা শুনিলাম, আমার স্ত্রী এক যুবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি এখানে কেন এলে? ভাগ্যে ইনি আজ কল্‌কেতায় গিয়েছেন!'

আমার চোখে যেন সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোক সহসা নিবিয়া গেল! আমি একটা বৃক্ষকাণ্ডে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইলাম। 'ভাগ্যে আজ ইনি কল্‌কেতায় গিয়েছেন!'—ভাগ্য! যাহার সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদ আমি নির্ব্বাসনদণ্ড বলিয়া ভাবিতেছিলাম, তাহার পক্ষে সেটা ভাগ্য! বোধ করি, পরম সৌভাগ্য,

নহিলে প্রণয়ীর সঙ্গে গোপন-সাক্ষাৎ করিবার এমন শুভ সুযোগ, নির্ব্বিঘ্ন অবকাশ কেমন করিয়া হইত! তাই আমায় কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য এত জেদ্, এত পীড়াপীড়ি, এত অনুরোধ! মূর্খ আমি সে-কথা বুঝিতে পারি নাই। আমি মূঢ়, তাই বালিকার ছলে ভুলিয়াছি! আমার মনে হইতে লাগিল, চারিদিক্ হইতে বৃক্ষপত্র সকল তরতর মরমর করিয়া বলিতেছে—প্রতারিত, প্রতারিত, প্রতারিত মূঢ়! আর প্রত্যেক ফুলটী বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে!

হায়, কেন আমি গৃহে ফিরিলাম! এ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য না-দেখিলে আমার কি ক্ষতি ছিল! আমার সরল বিশ্বাস, নির্ম্মল ভালবাসা লইয়া নিশ্চিন্ত অন্তরে দিন কাটাইতাম! হায়, কেন নদীর জোয়ার বহিয়া গেল!

সঙ্গে-সঙ্গে যে আমার জীবনের জোয়ারও চলিয়া গেল!

কি উদ্বেলিত আনন্দেই বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলাম! কতক্ষণে স্ত্রীকে দেখিব, মাথা-মুণ্ড কত কি বলিব, সারাপথ তা'ই ভাবিতে-ভাবিতে আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তাহার মালাগাঁথা দেখিয়া কৌতুকে জিজ্ঞাসা করিব—'কার তরে আর গাঁথ হার যতনে!' যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, সে ত ঐ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কয়েক হস্তমাত্র দূরে! কই, মুখের কথা মুখেই রহিল, কিছুই ত বলা হইল না!

'কার তরে আর গাঁথ হার যতনে!'—হার ত তাহার হাতেই রহিয়াছে! বোধ করি, ত্রস্ত-ব্যস্ততায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধের

হায় আর কি গাঁথা হইবে না? না—না—না!
কত ছিন্ন হার এমনই ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, আমারও থাকিবে। হায়, এক মুহূর্ত্তে কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন! যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, সে ঐ—ঐ! যে দেখিতে আসিয়াছে, সে-ও এই! কিন্তু হায়, মাঝে কি সুদীর্ঘ মরুময় ব্যবধান!

এই ত সেই মধু-যামিনী! ঐ স্বচ্ছ নীল জ্যোৎস্না-বিলসিত অম্বরের অন্তরালে কোথায় এমন মর্ম্মভেদী বজ্র লুকাইয়াছিল! কে জানিত, এই কৌমুদীশালিনী, কুসুমমালিনী মেদিনীর মধুময় হাসি এমন তীব্র হলাহল লুকাইয়া রাখিয়াছে! কে জানিত, এই ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার হৃদয়ে এত চাতুরী! হায় মাধুরী-লতা বলিয়া যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, সে সর্পিণী! 'সতী'র

কন্যা বলিয়া আদরে গৃহে আনিয়াছি! সমাজ-বিধি মানি নাই, বয়স্থা কন্যা বিবাহ করিয়াছি, কেবল প্রতারিত হইবার জন্য! নিশ্চয় এ সয়তানী বিবাহের পূর্ব্বে আর কাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। হায়, এই সংসার, এই নারী, এই দাম্পত্য-জীবন!

আমার স্ত্রীর সম্মুখে সে যুবককে দেখিয়াই আমি লজ্জায় চক্ষু ফিরাইয়াছিলাম। লজ্জা? কিসের লজ্জা? বিশ্বাস-ভঙ্গের লজ্জা! প্রত্যয় করিয়া প্রতারিত হইয়াছি, সেই লজ্জা! স্ত্রী অসতী, সেই লজ্জা! লাঞ্ছিত, লজ্জিত হইবার লজ্জা! যখন আবার দেখিলাম, তখন সে যুবক চলিয়া গিয়াছে। বোধ করি, আমার আগমন সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাই পলাইয়াছে। মনে পাপ না থাকিলে পলায় কেন? কে এ যুবক? কে এ? মনে হইল,

যেন কোথায় দেখিয়াছি। কোথায়? কোথায়? আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বে মাঠের উপর অশ্বত্থতলায়, মনে হয়, যেন ইহাকে কখন-কখন দেখিয়াছি। বোধ হয়, এ সে-ই।

চাঁদ ক্রমে ধীরে-ধীরে নারিকেল-কুঞ্জের শিখরে আসিয়া দাঁড়াইল! আমার স্ত্রী অনেক-ক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর তাহার অন্তস্তল হইতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। এ কি অতৃপ্ত প্রণয়ের ক্ষোভ? কিছুক্ষণ পরে সে হার ছিন্ন দেখিয়া চ্যুত কুসুমগুলি পুনরায় কুড়াইতে যত্নবতী হইল। কিন্তু সে-সময় বোধ হয়, তাহার মনও সেই কীর্ণ কুসুমরাশির মত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কুড়াইতে পারিল না; ছিন্ন মালা লইয়াই গৃহাভিমুখে

ফিরিল। আমিও বৃক্ষান্তরাল হইতে অগ্রসর হইলাম।

আমাকে দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। আনন্দে নয়, ভয়ে। তারপর যেন তা'র মুখ হইতে আপনা-আপনি বাহির হইল—'তুমি!'

'হাঁ, আমি।'

সে চকিতে একবার চারিদিক্ চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণ এয়েছ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'এই ত আস্‌ছি।'

ইতিপূর্ব্বে আমার মুখে কখন মিথ্যাকথা শুনে নাই, সে বিশ্বাস করিল এবং আশ্বস্ত হইল। আরামের একটা মৃদু নিশ্বাস শুনিলাম। তারপর আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিলাম। সে চকিত হইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, 'ঘরে চল।'

তাহার স্পর্শে আমার শরীরে যেন অসহ্য

জ্বালার সঞ্চার হইল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া গৃহে ফিরিলাম—আমার শয়নকক্ষে। হায়, বিদায়-কালে বুঝিতে পারি নাই, এ সুখের স্বর্গ হইতে চির-বিদায় লইতেছি! এ কোন্ সমাধিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম! আমার বিশ্বাস, ভালবাসা, সুখ, আশা, হৃদয়, সবই যে এখানে সমাহিত হইয়াছে!

আমি শয্যার উপর বসিলাম। সে আমার পদমূলে বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন ক'রে হাস্‌ছিলে কেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'তোমাকে দেখে হাস্‌ব না ত কি কাঁদ্‌ব?'

সে বলিল, 'তা কেন? তবে কল্‌কেতায় গেলে না কেন?'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল

—'ভাগ্যে!' কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হইয়া বলিলাম, 'জোয়ার ব'য়ে গেল যে!'

আমি শয্যার উপর স্থিরভাবে বসিয়া—সে কি বলে, শুনিবার অপেক্ষায়। সে-ও নীরবে নতমুখে বসিয়া সেই ছিন্ন হার লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। আমি বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এর মনে যদি কোন পাপ না-থাকে, নিশ্চয়ই সকল কথা খুলিয়া বলিবে। সে কি ভাবিতেছিল, জানি না। বোধ করি, সে-ও মনে করিতেছিল, আমি কিছু বলিব। বলি-বলি অনেকবার মনে করিয়াছি, কিন্তু লজ্জায় যে মুখে কথা সরিতেছে না! অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাস্‌ছ না কেন?'

হায়, মন না-হাসিলে কি মুখ হাসে? বলিলাম, 'এই ত হাস্‌ছি।'

'ও কী হাসি! কথা কচ্ছ না কেন?'

'এই ত কথা কচ্ছি।'

তারপর সে আমার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে বল না?'

তা'র সে কাতর চক্ষু দেখিয়া, ব্যাকুল স্বর শুনিয়া আমার অন্তর আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কুটিল, কুটিল, কি কুটিল! এই বালিকা—এত ছল শিখিল কোথা হইতে? সয়তানী সত্যই বলিয়াছিল, 'সাপকে কি ফণা ধর্‌তে শেখাতে হয়?'. কিন্তু কেবল স্ত্রী-লোকই কুটিলতা জানে, পুরুষ কি জানে না? আমি উত্তর দিলাম, 'আজ জান্‌তে পেরেছি, আমার সর্ব্বপ্রধান জমিদারীটা নীলেমে উঠেছে, আর একজন ডেকে নিয়েছে। এই জমিদারীটাই আমার সর্ব্বস্ব, আমার সৌভাগ্য-প্রদত্ত জায়গীর! আমি ফকির হব—ফকির হব!'

৪৯

দয়া-মমতা-হীন বিচারপতির স্থায়, মৃগয়ারত ব্যাধের মত তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

তৃতীয় দিন—ঘোর দুর্দ্দিন! আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন—বিশ্ব-সংসারের উপর যেন যবনিকাপাত হইয়াছে! বজ্র, বিদ্যুৎ, বাতাস, বারিপাতের আজ যেন মহোৎসব! কখন নারকীয় কোলাহল, কখন পৈশাচিক রোদন-ধ্বনি! এ কি উন্মাদ অভিনয়! আমার শয়ন-কক্ষের পাশের মাঠে সেই যে একটা বৃহৎ অশ্বত্থগাছ ছিল—যার তলায় সেই যুবাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছি—বাতাস হৈ-হৈ ক'রে এসে তা'র একটা মস্ত ডাল ভেঙে দূরে আছ্‌ড়ে ফেলে দিলে, আবার তখনই আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠ্‌ল! এই উন্মাদিনী প্রকৃতির সঙ্গে উন্মত্ত হইয়া মাতামাতি করিবার জন্ত -আমার সমস্ত হৃদয় যেন মাতিয়া উঠিল! যাই, নদী-

বক্ষের উপর ছুটিয়া গিয়া পড়ি! রুদ্রতালে তরঙ্গ নাচিবে, তরী দুলিবে, আমিও নাচিতে-নাচিতে তলাইয়া যাইব! কি মজা, কি মজা! আমি হো-হো করিয়া হাসিয়া বাহির হইলাম। ত্রিভুবন চমকিত করিয়া সহসা একটা বজ্রপাত হইল। আমার পা যেন আপনা-আপনি পিছাইয়া আসিল! হো-হো-হো,—মৃত্যুভয় কি মানবের মজ্জাগত? আমার হাসির শব্দে, কি অন্য কোন কারণে বলিতে পারি না, পুনরায় যেমন পা বাড়াইয়াছি, স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর পড়িল। কাতর নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া অতি ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন দুর্য্যোগে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'কল্‌কেতায়।'

'এ দুর্য্যোগে লোকে শৃগাল-কুকুর তাড়ায় না, আমি কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে দেব?'

'তুমিই ত যাবার জন্ম পীড়াপীড়ি ক'রেছেলে!'

'সেজন্ম যদি রাগ ক'রে থাক, আমায় মাপ কর। আজ্‌কের দিনটা থাক। ঝড়-বৃষ্টি থাম্‌লে যেও।'

'পা ছাড়! মিছে দেরি করিয়ো না! আজও আবার জোয়ার ব'য়ে যাবে। আমি যখন যাব মনে করেছি, যাবই। যে ঝড়-বৃষ্টির বাধা মান্‌ছে না, সে কি কারুর কথায় থাম্‌বে?'

'কেন থাম্‌বে না? কেন যাবে?'

'তোমায় ত বলেছি. আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

'বালাই! কি সর্ব্বনাশ? সেই জমিদারী নীলেম? তুমি আমার ইষ্টদেবতা! তোমার মুখে কখন মিছে কথা শুনি নি! সত্যি বল,

যদি নীলেম হয়ে থাকে, সে দোষ কি আমার ? আমার ওপর কেন রাগ করছ ?'

'কে বললে, তোমার ওপর রাগ করছি ?'

'আমার মন। ছেলেবেলা বাপ-মা আমায় ফেলে গিয়েছেন। জ্যেঠার বাড়ীতে ফেলা-ভাতে অতি দুঃখে মানুষ হয়েচি। সে কী দুঃখ, তুমি জান না! কিন্তু তোমায় পেয়ে সব ভুলেছিলুম। তোমায় পাব কখন আশা করি নি। তুমি দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলে, ভিখারিণী—রাজরাণী হয়েছিলুম। আবার আমায় নিরাশ্রয় করছ কি দোষে ? যদি না-জেনে কোন দোষ ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা কর।'

'পাগল! তোমার দোষ কি যে ক্ষমা করব ?'

'তবে কেন যাচ্ছ ?'

'ঐ একশ বার এক কথা! কতবার বল্‌ব ?'

'আচ্ছা, না-বল, আমায় পায় ঠেল না! শোন! আমার ভারি মন কেমন কর্‌ছে! বাবা, মা মর্‌বার আগে এমনি মন কেমন করেছিল। তুমি চ'লে যাচ্ছ, আবার তেমনি মন কেমন কর্‌ছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আর তোমায় দেখ্‌তে পাব না।'

'না-পেলে ক্ষতি কি ?'

'সে তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। আমি অবলা, আর কিছু জানি নি, কেবল তোমায় জানি। আমি কেবল তোমার সেবা কর্‌তে পারি, যদি দয়া ক'রে নাও। নইলে কাঁদ্‌তে পারি, সাধ্‌তে পারি, পায় ধর্‌তে পারি; তোমার কাছে ভিক্ষা কর্‌তে পারি, আর তোমার জন্য মর্‌তে পারি। আমি অবলা,

আর কিছু জানি নি, কেবল তোমায় জানি। জানি নি, কি কথা বল্‌লে তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হবে! আমায় দয়া কর, ভাসিয়ে দিয়ে যেও না। আমি বড় দুঃখিনী।'

'কিসের দয়া? কি দুঃখ? পা ছাড়।'

বোধ হয়, পদদ্বারা একটু জোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছিলাম। তাহার কোথাও আঘাত লাগিয়াছিল। সে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমারও মনে যেন একটা কাঁটা ফুটিল। সে বলিল, 'নিতান্তই পায় ঠেল্‌বে? ক্ষমা কর্‌বে না? কি দোষে আমায় ত্যাগ ক'রে চল্‌লে—তা'ও ব'লে গেলে না?'

'কি বিপদ্! তোমার কোন দোষ নেই—নেই—নেই! আর মিছে বাধা দিয়ো না। জোয়ার ব'য়ে যাবে।'

সে আমার পদধূলি লইয়া বলিল, 'আমি

তোমায় বাধা দেবার কে? আমি কীটাণু-কীট; তুমি মাড়িয়ে চ'লে যেতে পার। হায়, হায়, তোমার জোয়ার ব'য়ে যাবে, আমার যে জীবন ভেসে যাবে! এই যদি মনে ছেল, কেন আমায় ভালবেসেছিলে? কেন ভালবাস্তে শিখিয়েছেলে? আমি কাঙালিনী, জ্যেঠার বাড়ীতে বাসন মাজ্‌তুম—ভাত খেতুম, কেন আমায় এমন স্বর্গের ছবি দেখিয়ে আমার মনে সহস্র সাধ জাগিয়েছেলে? হায়, হায়, কপাল কি এমনি করেই ভাঙ্‌তে হয়? এমনি করেই কি বাদ সাধ্‌তে হয়? এ কি পুতুলখেলা? বুঝ্‌ছ না, আমি পুতুল নই—মানুষ? আমার জীবন-মরণ যে তোমার হাতে!'

'ভাল, কে মরে কে বাঁচে,- সে পরে বোঝা যাবে! এখন ত পথ ছাড়।'

'আচ্ছা, তুমি এস। তোমায় আর বাধা দেব না। কিন্তু, জেনো, আমি তোমারই জন্য প্রাণ রাখ্‌ব। তোমার পায় প্রণাম ক'রে, তোমার কাছে আমি এই বর নিচ্ছি। তুমি বিমুখ হলেও আমার দেবতা। আমি তোমায় না-দেখে মর্‌ব না। যদি তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, আমি সতীর মেয়ে হই, তোমাকে আবার এসে দেখা দিতে হবে, তবে আমি মর্‌ব।'

'হা—হা—হা,—সতীর মেয়ে সতী—সীমন্তিনী! বেশ ত! সাবিত্রী যমালয় থেকে সত্যবান্‌কে ফিরিয়ে এনেছেলেন। যে পারে; তা'র ফেরে।'

আমার পদধূলি লইয়া—এই 'আমার বর'—বলিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। আমি আর তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম না।

আমার মনে হয়, সকল মানুষেরই ভিতর একটা ক'রে ভূত থাকে। সে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমায়, কিন্তু জাগিলে মহা উপদ্রব আরম্ভ করে। তখন সে সামনে যা পায়, তা-ই ভাঙিয়া-চুরিয়া তছ্‌নছ্‌ করিতে চায়। খিড়্‌কীর বাগানে আমার স্ত্রীর সম্মুখে সে দিন সে যুবাকে দেখিয়া অবধি আমার মনের ভূতটা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে কেবল বলিতেছে—'মার, মার, নয় মর!' আমার একটা মন সেই ভূতটার সহিত মাতিয়া চলিল, একটা মন সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিতে-কাঁদিতে যাইতে লাগিল।

আমি পদব্রজে নদীকূলে পৌছিলাম। আমার পিছনে একজন লোক আসিতেছিল। বোধ হয়, আমার স্ত্রী পাঠাইয়াছিল। তাহাকে বলিলাম, 'তুই আমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে

নিয়ে আয়। ভারি দরকার, এখনই কল্‌কেতা যেতে হবে। আমি নদীকূলে অপেক্ষা করছি।' আমার ছল বুঝিতে না-পারিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কূলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, নদীও আজ উন্মাদিনী। সে ফুলিতেছে, ফাঁপিতেছে, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া নাচিতেছে, হা-হা করিয়া হাসিতেছে! তরঙ্গের দল মাতাল হইয়া তা'র বুকের উপর লাফাইয়া উঠিতেছে, আছাড় খাইয়া পড়িতেছে! আমার ভিতরের ভূতটা বলিতেছে—'মার, মার, নয় মর!' আমি মাঝিকে বলিলাম, 'এখন আমায় ওপারে পৌঁছে দিতে পারিস্? আমার ভারি কাজ, এখনই যেতে হবে। একশ টাকা বখ্‌শিস দেব।'

পুরস্কারের লোভে সে-ও আমার সঙ্গে প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ইচ্ছামৃত্যু মানুষের নাই, তাই সে তরঙ্গ-তুফানের কবল এড়াইয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই আমি আমার এটর্ণি-বাড়ী গেলাম এবং আমার সমস্ত বিষয় স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিলাম। ইহা আমার দান নহে—দণ্ড। দুশ্চারিণীর রূপ আছে, যৌবন আছে, পাপে প্রবৃত্তি আছে। তা'র উপর ঐশ্বর্য্য পাইলে মাতাল হইয়া হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইবে। বিলাসের স্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে অতল নরকে ডুবিবে। ইহলোকে, পরলোকে অনন্ত নরক। ইহাই পাপীয়সীর সমুচিত দণ্ড। একপক্ষ পরে এই উইল আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিতে উপদেশ দিলাম।

'মার, মার, নয় মন্ত্র'!—সে ভূত এখনও

আমায় উত্তেজিত করিতেছে! সেই সময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ভূতটা বলিল,—'চল্, চল্! মার, মার, নয় মর!' এ ভূতটা যেরূপ পিছনে লাগিয়াছে, আত্মহত্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর অন্য উপায় নাই।

'মার, মার, নয় মর!'—চল, যেখানে মৃত্যুর বিলাস-ভূমি! যেখানে রুধিরপানোন্মত্তা, নৃমুণ্ডমালিনী জিঘাংসা অট্টহাস্যে উদ্দাম নৃত্য করিতেছে! চল, যেখানে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রসকল ভৈরব-হুঙ্কারে কালানল উদ্গীরণ করিয়া চারিভিতে মৃত্যু বিস্তার করিতেছে! চল, যেখানে দন্তে-দন্তে ঘর্ষণ, অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝণাৎকার, মুমূর্ষুর আর্ত্তস্বর, শিবারব ও গৃধিনী-চঞ্চুরোলের একতান-বাদনে সংহার-নাট্যের অভিনয় হইতেছে!

যেখানে জীব-জননী মেদিনী সংসার-সন্তপ্ত সন্তানের চির-আরামের জন্য বিরাম-শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছেন! চল, চল, ঘুমাইতে চল!

আমি সেই রাত্রিতেই পশ্চিম রওনা হইলাম ও যথাসময়ে ফতেপুরে পৌঁছিলাম।

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে অনেকেই আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে নিষেধ করিল; বলিল, 'এ অঞ্চলে বিদ্রোহের ভারি উপদ্রব চলিতেছে।' কিন্তু আমার অন্তরের ভূতটা বলিতে লাগিল—'মার, মার, নয় মর!' আমি নামিয়া পড়িলাম। গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুম্—দূর হইতে সুহৃদের আদর-আহ্বানের মত আমার কানে পৌঁছিতে লাগিল।

ফতেপুর-যুদ্ধের বিস্তীর্ণ বিবরণ পাঠক সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে দেখিবেন।

তাহার সহিত আমার যতটুকু সম্বন্ধ, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। প্রায় সকল স্থলই রুধির-কর্দ্দমময়। কোথাও ছিন্নশির—নিকটে মস্তকবিহীন দেহ লম্বমান—হাতের বন্দুক খসিয়া পড়িয়াছে! আমি তুলিয়া লইলাম এবং অনেক টোটাও সংগ্রহ করিলাম। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একস্থানে দৃঢ়বদ্ধ দশ-বারো জন সশস্ত্র ইংরাজ অটলভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া আমি তাহাদের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

হেথা-সেথা গুলী ছুটিতেছে, মানুষ পড়িতেছে! একজন ইংরাজ আমাকে দেখিয়া বলিল, 'এখানে মরিতে আসিয়াছ কেন? পালাও, পালাও!'

৬৫

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'কেন, সাহেব, মরণটাও তোমাদের একচেটে ব্যবসা না কি?' সে আমার মুখ দেখিয়া আর কিছু বলিল না।

একদল সিপাহীকে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া আমরা গুলী চালাইতে আরম্ভ করিলাম। সিপাহীগণের সঙ্গে ইংরাজ একে-একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে কে যেন ধাক্কা দিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল।

কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি; চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছবি, সব ধীরে-ধীরে আমার চিত্তপট হইতে অপসৃত হইয়া গেল। কেবল মনে জাগিতে লাগিল—একখানি বিষণ্ণ-মুখ ও দুইটী নৈরাশ্য-কাতর চক্ষু।

চোরের কাহিনী

আমার নাম শুনিলে এখনই তোমরা ঘটী-বাটি সাম্‌লাইবে; খিড়কীর দরজা বন্ধ আছে কি না, তাহার খবর লইবে, এবং কোথা ছেঁড়া কাপড়খানা শুকাইতেছে, কোন্‌খানে ভাঙ্গা ছিঁচ্‌কেটা পড়িয়া আছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিবে। এত করিয়াও তবু নিশ্চিন্তি নাই। পাড়ায় কোনখানে আমার অভিসার হইয়াছে শুনিলে সে রাত্রিতে তোমার আর ঘুম হয় না। খুট্‌ করিয়া ইঁদুর নড়িলে চম্‌কিয়া উঠ—ঐ রে! দৈবাৎ যদি বাতাসে গাছ দুলিয়া তাহার ছায়াটা

নড়ে, তবে আর যায় কোথা? হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোক জড় করিয়া, লাঠি-সোঁটা লইয়া তাড়া কর—সেই ছায়াকে! এটা তোমাদের চিরকেলে অভ্যাস। আজীবন ত ছায়া ধরিবার চেষ্টাতেই ফিরিতেছ। বস্তুর পিছনে তোমরা কয় জন ধাওয়া কর?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি এতই মন্দ? আমরা কি মানুষ নই? মারিলে কি আমাদের লাগে না, না, কাটিলে আমাদের গা দিয়া দুধ পড়ে?

তোমরা একটা কথা শিখিয়া রাখিয়াছ, পরের দ্রব্য না-বলিয়া লইলে চুরি হয়। বেশ কথা! ঘোষালমহাশয় যখন সাহেবের অজ্ঞাতসারে আফিস্ হইতে কাগজখানি, কলমটী, পেন্‌শিল্‌টী, ছুরিখানি তাঁহার পুত্রকে আনিয়া দেন, তখন কি হয়? বড়বাবু যখন নয়-সিকায়

জিনিস কিনিয়া নয়-টাকা বিল্ করেন, তখন ?
না-বলিয়া লইলে চুরি, কাড়িয়া লইলে ডাকাতি,
কৌশলে লইলে ঠকামি,. এই ত তোমাদের
কথা ? আপনার বুকে হাত দিয়া কথা কও।
এ সংসারে ঠিক সাধু কয় জন আছে ? কেহ
ডাকাতি করিয়া কাহারও রাজ্য কাড়িয়া
লইতেছে ; কেহ চুরি করিয়া, কেহ ঘুষ্ লইয়া,
কেহ ফাঁকি দিয়া বিষয় করিতেছে ; কেহ
ঠকামি করিয়া বড় হইতেছে। এই সকল
লোককে তোমরা উপাসনা কর ; চিরস্মরণীয়
কর্‌বার জন্য কেতাব লেখ, তা'র নাম দাও
জীবন-চরিত কি ইতিহাস,—কেবল মিছে
কথার চাষ,—যা মুখস্থ না হ'লে ছেলেদের
পীড়ন কর, আর উপন্যাস পড়িলে বকো।
জান না যে, জানা-মিছে-কথা বরং নিরীহ,
কিন্তু যে-মিথ্যা সত্যের মুকোষ পরিয়া আসে,

তা কত ভয়ঙ্কর! ধিক্ তোমাদের! আমরাই কেবল চোরদায় ধরা পড়িয়াছি?

কেহ মনে করিয়োনা, আমি চুরির সাফাই গাহিতেছি। এ যে কত মন্দ কাজ তা আমি যত জানি, তোমরা তত জান না। পথের প্রত্যেক বাঁকে-বাঁকে পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে ভাবিয়া তোমাদের কখন গা-ছম্‌ছম্ করিয়াছে কি? আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে মানুষের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাপের দয়ায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ কি? সর্ব্বদা ভয়, সকলের দৃষ্টিকে সন্দেহ, মানুষমাত্রকেই শত্রু মনে করিয়া কখন জীবন-যাপন করিয়াছ কি? পাপার্জ্জিত অন্ন মুখে তুলিতে গ্রাসে-গ্রাসে ধরা পড়িবার আতঙ্কে শিহরিয়াছ কি? চোরের মন, চোরের স্বপ্ন কেমন, জান কি? ধরা পড়িয়া চোরের মার কখন

খাইয়াছ কি? জেল্ কিরূপ দণ্ড কল্পনা করিতে পার? সকলের উপেক্ষিত, ঘৃণিত, নিন্দিত, স্বজন-পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত জীবন কখন বহন করিয়াছ? তোমরা মনে কর, এ-সকল অনুভব করিবার শক্তি আমাদের নাই। সেটা তোমাদের ভ্রম। অভ্যাসে মানুষ সহিষ্ণু হয় বটে, কিন্তু অনুভূতি একেবারে লোপ পায় না। আমরাও মানুষ। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের গড়িয়াছেন। এক কারিকরের কারিকুরি। কাঁটা ফুটিলে আমাদেরও গায় রক্ত পড়ে, ব্যথা লাগে। আমাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা আছে। নহিলে আজ আমি এই দূর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়াছি কেন? স্নেহের দায়েই আসিয়াছি। কিন্তু কথাটা গোড়াগুড়ি না-বলিলে তোমরা বুঝিবে না।

সীমন্তিনী

আমার একটী খুড়্তুত ভগ্নী আছে, বড় স্নেহশীলা, বড় কোমল-প্রকৃতি। অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হ'য়ে সে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লয়।

আমার পিতা বড় কৃপণ ছিলেন। ছেলে-দের যে ক্ষিদে পায়, আর খাবার যে পয়সা নহিলে আসে না, তাহা, বোধ হয়, তিনি জানিতেন না। আমি কখন-কখন তাঁহার হাত-বাক্স হইতে দু'একটা পয়সা তাঁহার অজ্ঞাতসারে লইয়া, সে-কথাটা তাঁহাকে বুঝা-ইতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ফল ফলিত বিপ-রীত। পিতা আমায় নিদারুণ প্রহার করি-তেন, আর দূর হইতে তাহা দেখিয়া আমার সেই খুড়্তুত ভগ্নীটী ছিন্নাঞ্চলে বারবার চক্ষু মুছিত।

আমাদের বাড়ীতে কেহ আমরা পেট-

ভরিয়া খাইতে পাইতাম না। ভগ্নীটী ত নয়ই। আমি সেই অপ্রচুর অন্ন অল্পমাত্র খাইয়া তাহাকে খাওয়াইতাম এবং আপনি চুরি করিয়া পেট ভরাইতাম।

আমাদের বড়-বাগানে আম পাকিত। তাহার রসাস্বাদ, আমি ত আমি, দেবতারাও কখন পাইতেন না। তাঁহারি সমস্ত সুধারস টাকার আকার ধরিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিত। দেবতা না-খান্, আমি না-খাই, ভগ্নীটীকে আম খাওয়াইবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইত। কিন্তু উপায় কি? বাবার এমনি সাফ্ নজর, বাগানে কোন্ গাছে কয়টা আম পাকিয়াছে, কয়টার রং ধরিয়াছে, তিনি ঘরে বসিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন। তাহার একটী আম কা'র সাধ্য হজম করে। আমাকে অগত্যা পরের বাগানে গতায়াত করিতে

হইত। যত পারিতাম, পাড়িয়া বাড়ী আনিতাম। তাহাতে দেখিলাম, বাবার তত আপত্তি নাই। আপত্তি দূরে থাক্, তিনি আমার সংগৃহীত আমগুলির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। পিতা সন্তুষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমিও মধ্যে-মধ্যে লাউটা, কুম্‌ড়াটা, কলার কাঁদিটা আম্‌দানী করিতে আরম্ভ করিলাম। তোমরা মাঝে-মাঝে একটা শ্লোক আওড়াও না—'পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ'—ইত্যাদি ?

এমনি করিয়া, তোমরা যাহাকে বল রীতিমত স্বভাব-বিগ্‌ড়ান এবং আমরা বলি ক্রমোন্নতি, আমার তাহাই হইল। ক্রমে ধরা পড়িলাম, বেত খাইলাম, দুই-একবার জেল্‌ও খাটিলাম।

বেত খাইয়া যেদিন বাড়ী ফিরি,—ভগ্নীটী আমাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কত সেবা করিয়া যে, সে আমার ঘা শুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। জেলে তা'র জল-ভরা চোখদুটী, আর সেই কচিমুখের 'দাদা'-সম্ভাষণ কেবলই আমার মনে পড়িত।

ক্রমে আমি বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া দূরে একা বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনান্তে একবার ভগ্নীটীকে না-দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না, চুরি করিয়া দেখিয়া যাইতাম। আমার সমস্ত জীবনই পঙ্কিল, কেবল একস্থানে কোন আবিলতা ছিল না— আমার এই অকপট ভগ্নী-স্নেহে। পঙ্কজ যেমন পাঁকে ফুটে—পরিত্যক্ত ছিন্নবাসে, পাতের ফেলা-ভাতে ভগ্নীটী তেমনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং একদিন একজন বড়-লোক আসিয়া পদ্মটী তুলিয়া লইয়া গেল।

আমাদের গ্রাম হইতে বহুদূর হইলেও

সীমন্তিনী

আমার ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ী ও ভগ্নীপতিকে আমি ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিলাম। চোরের সর্ব্বস্ব যে তাহার কাছে গচ্ছিত।

নিত্য সন্ধ্যায় ভগ্নী খিড়্‌কীর বাগানে বসিয়া মালা গাঁথিত। ভগ্নীপতিও তথায় উপস্থিত থাকিত। আমি এক-একদিন লুকাইয়া তাহাদের দেখিয়া আসিতাম।

একদিন দেখিলাম—ভগ্নী একা বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, ভগ্নীপতি তথায় উপস্থিত নাই। বোন্‌টীর সঙ্গে একটা কথা কহিবার,—আর অনেকদিন শুনি নাই—তাহার মুখে দাদা-বলা শুনিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বলিল, 'তুমি এখানে কেন এলে? ভাগ্যে আজ ইনি কল্‌কেতায় গিয়েছেন!'

সে সেই মতই জানিত। কিন্তু আমার চোরের কান—দূরে শুষ্ক পত্রের উপর সসন্তর্পণ পদশব্দ শুনিয়া চোখ চকিতে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিল। নাক বলিল—'মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ'! দেখিলাম, ইনি সশরীর উপস্থিত। যেমন নায়কের প্রবেশ, অমনি চোরের প্রস্থান। কিন্তু চোর জানিয়া গেল যে, নায়ক তাহাকে দেখিয়াছেন, নহিলে, গাছের আড়ালে অমন করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইবেন কেন? ভয় হইল, বুঝি কি-একটা কাণ্ড ঘটে!

ইহার দুই-তিনদিন পরেই ভগ্নীটী আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ী সদর-দরজা দিয়া এই আমার প্রথম প্রবেশ। আমি অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলাম, এই দুই-তিনদিনের মধ্যেই তাহাকে আর চেনা যায় না, কেমন শীর্ণ, বিশ্রী, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চোখে-মুখে কালি পড়িয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই সে কাঁদিয়া বলিল, 'দাদা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ইনি রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছেন!'

শুনিয়া রাগে, দুঃখে আমার বুকের ভিতর হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, যাক্ গে বাঁদরটা! কিন্তু মুখে বলিলাম, 'আমায় কি কর্‌তে হবে, বল!'

'কোথায় গেলেন, কোন রকমে সন্ধান কর্‌তে পার না?'

হরি হরি! সন্ধান! যে নিরীহ, নিরপরাধা বালিকাকে অকারণে ব্যথা দেয়, তা'কে কেবল সন্ধান! মূর্খ বোন্‌টা বলিল না কেন, তোমার কোমরে লুকান যে ছোরাখানা আছে, সেই-খানা তা'র বুকে বসিয়ে দিয়ে এস! বোধ করি, হিঁদুর মেয়ে তা পারে না।—এরা মরে, মারে না। মনের রাগ মনে মারিয়া বলিলাম,

'তা আর শক্ত কি ? সাত-তলার ওপর কোন্ বাক্সে টাকা-গয়না, কোথায় কি আছে, যে সন্ধান করতে পারে, তা'র পক্ষে একটা জল-জীয়স্ত মানুষের সন্ধান করা কী শক্ত ! কেবল সন্ধান করব, আর কিছু না ?'

'না।'

না ত না ! ভগ্নী আমায় যাতায়াতের খরচ দিতে আসিল, আমি লইলাম না। আমার বাপ নাই, মা নাই, থাকিতেও কেহ নাই ; আছে কেবল এই বোন্‌টী। ইহার কাছ হইতে টাকা ! পাড়ার পাঁচ-গৃহস্থের বাড়্-বাড়ন্ত হ'ক !—আমার টাকার ভাবনা কি ? বলিলাম, 'টাকা দিতে হবে না। কিন্তু তুই অত ক'রে ভাবিস নি। আমি নিশ্চয় তা'কে সন্ধান ক'রে ধ'রে আন্‌ব। তুই বুঝি সে গিয়ে অবধি কিছু খাস্ নি ?'

ঘরে টাট্‌কাফুলের গোড়ে দিয়ে সাজান সেই বাঁদরের একখানা ছবি ছিল, আমি ভগ্নীকে বলিলাম, 'তুই ঐ ছবি ছুঁয়ে বল্— খাবি, তবে আমি তা'কে খুঁজতে যাব।'

কি বিপদ! বোন্‌টা এমন প্যান্‌পেনে জান্‌লে আমি ও ছবির কথা তুল্‌তুমই না। সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল—'খাব।'

তাহাকে শান্ত করিয়া বিদায় লইলাম এবং সেইদিনই কলিকাতায় রওনা হইলাম। পয়সা-কড়ি হাতে কিছু ছিল না। চোরের হাতে কখন কিছু থাকেও না, আর থাকিলেও তাহা খরচ করিতাম না। অত নিঃস্বার্থ পরোপকারী আমি নই। তারপর কলি-কাতায় পৌঁছিয়া, কেমন করিয়া—নি-খরচায় হাটেলে হোটেলে খাইয়া—সেই হনুমান্‌টার সন্ধান ও রেলওয়ে কোম্পানিকে কৃতার্থ

করিতে-করিতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া পৌঁছিলাম, সে স্বতন্ত্র কথা। এ ইতিহাসের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে যখন আমার আত্ম-জীবন-চরিত লিখিব, তখন বলিব। তবে লোকহিতার্থে একটা কথা বলিয়া রাখি, এ-যাত্রায় আমার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল যে, লোকে ঠকিবার জন্য যত উৎসুক, ঠকাইবার জন্য তত নহে। একটু প্রলোভনের টোপ্ দিলেই হাসিমুখে ঠকে।

উত্তর-পশ্চিমে গিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু ভগ্নীপতিকে সন্ধান করিয়া বাহির করা বড় দুষ্কর হইয়া উঠিল। আমি যখন আস্ফালন করিয়াছিলাম, সাত-তলার উপরে মালামালের সন্ধান করিতে পারি, তখন ভাবি নাই যে, সাত-তলায় টাকা-গয়না আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, কিন্তু জীয়ন্ত-মানুষ নড়িয়া-

৮১

চড়িয়া বেড়ায়। ভগ্নীপতিকে ধরা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। যিনি সাধুকে বলেন সাবধান হইতে এবং চোরকে মালামালের সন্ধান দিয়া থাকেন; যিনি মাখন-চুরি বসন-চুরি হইতে মন-চুরি পর্য্যন্ত বিদ্যায় সুনিপুণ, সেই চোরের চোর, রসিক-শেখর দয়া করিয়া সন্ধান না-দিলে আমার দ্বারা আর কার্য্যো-দ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মনে-মনে ডাকিলাম, 'হে বসন-চোর, হে মাখন-চোর, হে মন-চোর, শুনেছি তুমি 'লুকোচুরি'-বিদ্যায় অদ্বিতীয়, দয়া ক'রে সেই গর্দ্দভটার সন্ধান বলিয়া দাও, নহিলে সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন যাহা রাখিয়াছ, তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। হে চোর-চূড়ামণি! সে মরিলে আমি বাঁচিব না।'

চোখ দিয়া দু' চার ফোঁটা জলও পড়িল! তাহাদের বিস্তর ধম্‌কাইলাম যে, তোরা

এমন গলিয়া পড়িলে আমায় মালামালের সন্ধান দিবে কে? তা'রা অগত্যা থামিল। কিন্তু ভগ্নীপতির কোনই সন্ধান হইল না। অবশেষে মনে-মনে ভাবিলাম, যখন এতদূর আসিয়াছি, এ সুযোগটা কি ছাড়া উচিত? যুদ্ধ হইতেছে, পঙ্গপালের মত লোক মরিতেছে। যে মরিতে যায়, সে-ও কিছু রেস্ত সঙ্গে রাখে। হরিনাম নয়, নগদ রেস্ত। কিছু হাতাইতে পারিব না? কিন্তু এ সাহেবী পোষাকটা ছাড়িতে হইবে। ইহাতে ডাক্‌-বাংলার পিয়াদারা ঠকিয়াছে। সিপাহীরাও যদি ঠকে? সে-ঠকা আমার পক্ষে বড় সুবিধার হইবে না। হ্যাট্‌-কোট্‌ ছাড়িয়া ধুতি-চাদর লইলাম। গভীর রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই, বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়। এমনি করিতে-করিতে ফতেপুরে পৌঁছিলাম।

দিবসে ভারি হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। অনেক মরিয়াছে। ঘোর রাত্রিতে মাঠে, পথে, আমি গাঁট্-পকেট্ হাত্ড়াইয়া বেড়াইতেছি। বিদ্রূপে কি ক্রোধে বলিতে পারি না, আমার কীর্ত্তি দেখিয়া মাথার উপর তারাগুলো ঝক্ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আকাশের এক কোণে একখানা শীর্ণ চাঁদ যেন ভয়ে-ভয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে! তা'র মলিন কিরণ মৃতের ম্লান মুখের উপর পড়িয়া অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। উঃ, কী সে-সব মুখ! কোনখানা যন্ত্রণা-বিকৃত, কোনখানায় উপেক্ষার হাস্য, কোনখানার উপর জিঘাংসার করাল ভ্রূকুটি! আলোয়, অন্ধকারে, নিস্তব্ধতায় মাঠ গম্‌গম্ করিতেছে। আমার গা-ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। কি করি—ব্যবসা! কিন্তু এরূপ অপহরণে মজা নাই। সতর্কতায় ও কৌশলে যেখানে বোঝাপড়া, সেইখানেই

ত চুরির মজা ও বাহাদুরী! যেখানে সহস্র বাধা-বিঘ্ন, সেইখানেই ত চুরি করিয়া তৃপ্তি। চোখের কাজল যে চুরি করিতে না-পারে, তা'র চোর-বিদ্যায় ধিক্!

একজনের মুখে শুনিয়াছিলাম, কোন চোর-পুঙ্গব প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড আত্মসাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন—'ভেনি, ভিডি, ভিসি (veni, vidi, vici), অর্থাৎ, এসে যেমন লক্ষ্য, অমনি চক্ষুদান। কথাকয়টা চুরি-ডাকাতি প্রভৃতির মহামন্ত্র—শিখিয়া লইলাম। যেখানেই যাই-তাম, বলিতাম--'ভেনি, ভিডি, ভিসি।' কিন্তু এখানে সে মহামন্ত্রের কোন মাহাত্ম্যই নাই। যাহার লইতেছি, সে একেবারে নিঃসাড়। একটু নিশ্বাস ফেলে না, একটা হাঁ-হুঁ-ও করে না! ওঃ, কী হিম-শীতল নিশ্চেষ্টতা! দূর হ'ক ছাই! কিন্তু রাগ করিলে'কি হইবে, এ যে জাত-ব্যবসা!

এইরূপ ক্ষুণ্ণমনে অগ্রসর হইতে-হইতে দেখিলাম, একস্থানে দশ-বারো জন ইংরাজ পড়িয়া আছে! কিন্তু এ কি! এদের কাছে এ ধুতি-পরা মূর্ত্তি কে? নিকটে গিয়া দেখিয়াই আমারও নিশ্বাস নিশ্চল হইল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিল। এ যে আমারই ভগ্নীপতি!

অন্ধকারে আমার চক্ষু আবছা দেখিতে পায়। অল্প আলো আমার পক্ষে দিন। মুখ দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি কে মট্‌কা-মেরে প'ড়ে আছে, কা'র সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে, কে ঘোর নিদ্রামগ্ন। সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সে এখনও মরে নাই, অচেতন হইয়া আছে। ছুটিয়া জল আনিয়া তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলাম। সে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?'

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, সে-স্বর যেন কোন্ লোকান্তর হইতে আসিতেছে! সে আবার প্রশ্ন করিল, 'কে তুমি?'

আমি বলিলাম, 'চোর।'

বোধ হয়, বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'চোর কে?'

আমি আর কি বলি! বলিলাম, 'তোমার সম্বন্ধী।'

'সম্বন্ধী কে?'

'সেই যে—তোমার মনে পড়ে না?—তুমি কল্‌কেতা যেতে-যেতে ফিরে এলে, বাগানে গিয়ে দেখ্‌লে, তোমার স্ত্রীর কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—সেই আমি।'

সেই অন্ধকারে তাহার ঘোলা চোখ দু'টি যেন জ্বলিয়া উঠিল!—বলিল, 'তুমিই তবে তা'র প্রণয়ী? তুমিই আমার বুকে ছুরি মেরেছ?'

এর মনে যে এমন হীন সন্দেহের উদয় হয়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম, হয় ত কোন-রকমে টের পেয়েছিল আমি চোর, তাই আমার আসাতে রাগ করেছিল। আমার বিজাতীয় রাগ হইল। সে যে মুমূর্ষু, তা ভুলিয়া গিয়া বলিলাম, 'ছুরি মারি নি, কিন্তু মানুষ! ছিঃ, শুনেছি, তুমি লেখাপড়া শিখেছ! তোমার আক্কেল নেই? আমি চোর বটে, কিন্তু পাষণ্ড নই, বর্ব্বর নই, তোমার মত হীন নই! আমাদেরও ধর্ম্মজ্ঞান আছে। সে আমার বোন্। তুমি অতি মূর্খ! তা'র মুখ দেখে বুঝ্‌তে পার নি—সে পবিত্র? তা'র চোখ দেখে বোঝ নি—সে দেবী?'

সে আমার হাত ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অতি দুর্ব্বল, পারিল না। আমিই তাহার সেই মৃত্যু-হিম হাতখানি ধরিলাম। সে অতিশয়

ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিল, 'সত্যি কথা? আমার সম্বন্ধী আছে, কখন ত শুনি নি।'

'কি ক'রে শুন্‌বে? আমি চোর, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, কে স্বীকার কর্‌বে? বাপ-মা আমায় ছেলে ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। আমার মা তোমার স্ত্রীকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিলেন, তোমাকে আমার কথা না-বলে। তুমি তা'কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?'

লোকটা খামকা মাঝখান থেকে একটা বেখাপ্পা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'কেন তুমি চোর হ'লে?'

'আরে কও কথা! তোমার যে দেখ্‌ছি বেজায় ব্যথা! বাঘকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি মানুষ খাও কেন? গাছকে জিজ্ঞাসা কর, বেঁকে উঠেছ কেন? অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর, দেখ্‌তে

পাও না কেন? অত তর্ক-বিচার করবার কি এখন আর তোমার সময় হবে? ধর, এটা আমার একটা রোগ। উনপঞ্চাশ বাইয়ের এক বাই। এ রোগের চিকিৎসা করান উচিত।'

রক্ত-মোক্ষণে তখন তা'র মস্তিষ্ক অতিশয় দুর্ব্বল, কি বল্‌ছে, নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। মর্‌তে চলেছে, আর আমায় উপদেশ দিচ্ছে, 'ছি, চুরি করা কি ভাল!'

'ও-সব শিশুবোধের নীতিকথা।—ভালমন্দ জানি নি, বুঝি নি। তবে কাজটা যে সুবিধের নয়, আজকে তা হাড়ে-হাড়ে বুঝ্‌ছি।'

'কেন?'

আবার বলে—কেন! 'কেন? আমরণ সংসারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা! কেন? সে ভগ্নী, তুমি ভগ্নীপতি, তোমাকে আস্‌তে দেখে পালাতে হ'ল! তা'তেই ত এ বিষ উঠ্‌ল।

সংসারে সেই বোন্‌টি আমার একটীমাত্র স্নেহের ধন, এই লুকোচুরি খেলে তা'রই বুকে ছুরি দিলুম! আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ—কেন? চুরি আর কর্‌ব না। এই দেখ, মড়ার গাঁট্‌-পকেট্‌ থেকে চুরি ক'রে যা কিছু নিয়েছি, সব ফেলে দিচ্ছি। চুরি আর কর্‌ব না।'

'তবে কি কর্‌বে?'

লোকটা মর্‌তে-মর্‌তেও জ্বালালে! কিন্তু বড় মিছে বলে নি। সত্যই ত! আজীবনের অবলম্বন যখন ছাড়্‌তে হবে, তখন কি কর্‌ব? কিন্তু এখানে ব'সে—চারিদিকে মৃত, মুমূর্ষুর সঙ্গে কথা কইতে-কইতে কি ঠিক কর্‌ব, কি উত্তর দেব? এই যে এখানে যারা প'ড়ে রয়েছে, তা'র মধ্যে কত লোক যে হ্যান্‌-কর্‌ব, ত্যান্‌-কর্‌ব, কত কি কর্‌ব বলেছিল! এখন সব কি কর্‌ছে? ভগ্নীপতিকে বল্‌লুম, 'সে যা

হয়, পরে ঠিক করা যাবে। দেশ-হিতৈষী হব, কি নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত গ্রহণ করব, তা কি এখানে ব'সে ঠিক করা যায়? সে এখনকার কথা নয়। এখন তুমি চলেছ, বুঝ্‌ছি; বুঝেছি, সেও যাবে; আর বুঝ্‌ছি, তোমাদের দু'জনকে আমিই মারলুম! বাঃ বাঃ! চোর হয়ে কেমন মজা করলুম, দেখ্‌ছ? ভদ্রলোকের এ কাজ নয়। যাদের দয়া-মায়া আছে, স্নেহ-মমতা আছে, তাদের এ কাজ নয়। চুরি আর করব না। মোট বইতে হয়—ও-বি আচ্ছা!'

হাসি-ঠাট্টা ক'রে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেব মনে করেছিলুম, কিন্তু চোখদু'ট মানা মান্‌লে না। বোধ করি, আমার সেই দর-বিগলিত ধারা দেখে আমার কথায় তা'র প্রত্যয় হ'ল। বল্‌লে—'তোমার কথা সত্য,'—ব'লে, ফোঁস

ক'রে এমনি একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে যে, আমার ভয় হ'ল, সব বুঝি ফুরাল। কিন্তু না, দেখি, সে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছে। আমি বল্‌লুম, 'সত্য, সত্য, সত্য! তোমার মৃত্যু নিকট, তোমার কাছে এখন মিথ্যা ব'লে আমার কোন লাভ নেই। তুমি তা'র স্বামী; বরং তুমি একটু শান্তিতে মর, সেইটাই আমার ইচ্ছা। তুমি মৃত্যুকালে জেনেছ—সে সতী,—সেটা শুন্‌তে পেলে তা'র জীবনভার অনেক লাঘব হবে।'

'সে সতী, সতী, সতী। তুমি গিয়ে তা'কে বোলো। বোলো, আমি অতি পাষণ্ড। বোলো, জীবনে একবার তা'কে ভুল বুঝে-ছিলুম—সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ দিয়ে কর্‌ছি। আর বোলো, আস্‌বার সময় তা'র যে বিষণ্ণমুখ, নৈরাশ্য-কাতর চোখ দু'টী দেখে

এসেছি, সেই ছবি বুকে ক'রে চল্‌লুম। ভাই, তুমি চোর হও আর যা-ই হও, তুমি তা'র ভাই। আগে যদি পরিচয় পেতুম, আদর ক'রে নিতুম। কেন, ভাই, আগে পরিচয় দাও নি? হায়, হায়, হায়! অভাগিনীর কেউ রইল না, তুমি তা'কে দেখো!'

এই কথায় আমার মনে হ'ল, তা'র মনে আর কোন সন্দেহ নাই। আর সে কথা কহিল না। আমার বোধ হয়, সত্যই সে তা'র ধ্যান-মগ্ন হ'ল!

ক্রমে ভগ্নীপতির অবস্থা আরও হীন হইয়া আসিল। 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!'— আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি ঠাকুর-দেবতা মানো?'

সে বলিল, 'মানি।—সেই আমার ইষ্ট-দেবী।'—ইহাই তাহার শেষ কথা।

ভগ্নীপতির পকেটে কিছু টাকা ছিল। সেই টাকায় তাহার সৎকার করাইলাম। মানবের এই শেষ—মুষ্টিমেয় ছাই! ঘৃণা-হিংসা, পাপ-তাপ, আশা-তৃষ্ণা, স্নেহ-ভাল-বাসার সমষ্টি এই জীবন—নিদর্শন তা'র এক মুঠা পাঁশ! সব ফুরাইল!

ফুরাইল কি? এখনও যে ভগ্নীটীর বুকে বজ্রাঘাত করিতে হইবে। সে কাজ যে আমার!—তাহাকে যে খুন্ করিতে বাকি!

বিধবার কাহিনী

দিন যায়, থাকে না। কারুর হাসির লহরে, কারুর রোদন-ধারায় দিন যায়, থাকে না। যেদিন ষোড়শবর্ষ বয়সে আমার কপাল অন্ধকার ক'রে সিন্দূর-শিখা চিরদিনের জন্য নিবে গেল, তারপর একুশ বৎসর অতীত হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এই একুশ বৎসরের ইতিহাস,আমার জীবনের একদিনের ইতিহাস।

লোকে আমাকে দেখে বলে, এত বয়েস হয়েছে, তবু যেন মনে হয়—বালিকা। তা'রা ত জানে না যে, আমার কেবল বয়সই বেড়েছে, আমি ত আর বাড়িনি। মনের বয়স বাড়ে ঘটনায়। লোকে বলে, কত

দেখ্‌লুম, কত শুন্‌লুম! আমার যে একদিনে সব দেখা-শোনা শেষ হ'য়ে গিয়েছে!

সেই ত সংসার রঙ্গমঞ্চ—নিত্য কত অভিনয় হচ্ছে! অঙ্কের পর অঙ্ক—কত রস, কত রঙ্গ, কত সাজ! আমি কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখি। শিশু যেমন সংসারে এসে কাউকে চেনে না, জানে না, বুঝে না; কারুর সঙ্গে, কিছুর সঙ্গে আপনাকে মিশ খাওয়াতে পারে না, আমিও তেমনি কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখি। কিন্তু শিশুরও হাসি-কান্না আছে, আমার তা'ও নাই। আমার হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে। কোন রসেই আর রসে না। সেখানে অশ্রুর তরঙ্গও নাই।

ফতেপুর থেকে ফিরে এসে প্রথম-প্রথম দাদা নিত্য আমাকে কাঁদাবার চেষ্টা কর্‌ত। তাঁর শেষ কথাগুলি বারবার কত রকম ক'রে

বল্‌ত। সে নিজে কাঁদ্‌তে আর আমায় বল্‌ত, 'পোড়ারমুখি, তুই কাঁদ্‌, কাঁদ্‌, নইলে পাগল হবি, ম'রে যাবি।' আমার চোখে যে জল নাই, দাদা! এখন আর সে সে-চেষ্টা করে না।

এক-রকম পদার্থ আছে, জল্‌তে-জল্‌তে ছুট্‌তে থাকে। তা'র সংস্পর্শে যা-কিছু আসে, তা'তেও আগুন ধরে। আমি সেই উল্কারূপিণী। পিতৃগৃহ পুড়িয়েছি। তারপর স্বামি-গৃহে আগুন ধরিয়ে জল্‌তে-জল্‌তে চলেছি। আর কত জল্‌ব, কত চল্‌ব; ভগবান্, এ বারিহীন মরুর কি শেষ নাই? এ জ্বালারও অন্ত নাই? হায়, বসুন্ধরা, বিষধরের ফণায় বাস কর, তাই বুঝি, তোমার এত জ্বালা! আমার এ অনন্ত দাহ কেন? কি পাপে?

বিধবার কাহিনী

আমার দু'দিনের খেলাঘর একদিনে ভেঙে গেল, কি পাপে? পনেরবছর বয়সে এমন কি পাপ করেছিলুম যে, তুষানল তা'র প্রায়শ্চিত্ত? আমার সে ক্ষুদ্র খেলাঘরটী তোমার অনন্ত স্থানের কতটুকু জোড়া ক'রে ছিল? সেটিকে ভেঙে তোমার কী কাজ সিদ্ধ হ'ল, প্রভু? আমার সিঁথের সিঁদূরটুকু মুছে নিয়ে তুমি কা'র কপালে রাজটীকা পরালে? আমার হাতের লোহাটুকু কেড়ে নিয়ে তোমার কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খল গড়ালে? এ ক্ষুদ্র তৃণের উপর বজ্রাঘাত ক'রে তোমার কী পৌরুষ বাড়ালে? শুনেছি, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী! অন্ধকার ধরণীগর্ভে কোথায় কি কীটাণু আছে, তুমি দেখ; পিপীলিকার পদশব্দ শুন্‌তে পাও! কেবল আমারই হৃদয়ের মূক বেদনা তুমি দেখ্‌তে

পাও না? আমার বুক-চাপা কান্না তোমার কানে উঠে না? সব দেখ, সব শোন, কেবল আমারই বেলা পাথর হ'য়ে ব'সে আছ!

দিন ছিল—যখন প্রত্যেক দিনটীকে সৌভাগ্যের মত, দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, বরণ ক'রে নিতুম। নারীজীবন পেয়েছি ব'লে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌তুম। প্রভাতে স্বামীর পদধূলি লয়ে উঠ্‌তুম্, আনন্দে আমার হৃদয় তর্‌তর্ ক'রে কাঁপ্‌ত। ইচ্ছা হ'ত, ঐ পাপিয়ার মত আকাশ ছেয়ে গান গেয়ে বেড়াই। সেই পাখী এখনও গায়, সেই মল্লিকা এখনও ফোটে, সেই ত বাতাস এখনও বয়, কিন্তু তখন ত গায় এমন বিষ ছড়াত না!

এখন দিনগুলিকে নিয়তির অভিশাপ ব'লে মনে করি। সূর্য্য উঠ্‌তে দেখ্‌লে ভয় হয়। মনে হয়, আবার সেই সংসার,

সেই নীরস নিত্য-কর্ম্মভার। সেই সব জঞ্জালের রাশি, সেই দেঁতো-হাসি নিয়ে দিন কাটাতে হবে। সেই অরুচির আহার, অনিদ্রার শয়ন, লোকের সঙ্গে মিছি-মিছি আলাপ।

আমার প্রথম যখন এই দশা হ'ল, তখন প্রতিবাসিনীরা এসে কত সান্ত্বনা দিত,সমবেদনা জানাত। তাদের দেখ্‌লে আমি ছুটে পালাতুম। মাসীমা আমায় ধ'রে-ধ'রে এনে তাদের কাছে বসাতেন। আমার জন্য তা'রা কাঁদ্‌ত, কিন্তু আমার পোড়া-চোখে জল ছিল না। খানিক হা-হুতাশ ক'রে তা'রা বিরক্ত হ'য়ে উঠে যেত, আমি বাঁচ্‌তুম। ক্রমে পাড়ায় রব উঠ্‌ল, আমি পাষাণ। বল্‌তে পারিনি—শুনেছি, পাথর তাতে ফাটে, মাটী ধুল হয়; জমাট-বাঁধা বরফ গ'লে জল হ'য়ে যায়; কেবল রক্ত-মাংসের পিণ্ড নারীর শরীরেই এত সয়!

ক্রমে দিন যেতে লাগ্‌ল। বছরের পর বছর ফির্‌ল। এমনি ক'রে পাঁচবছর কাট্‌ল, আমার কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। আমার অবস্থা দেখে মাসীমা ভয় পেলেন, দাদা ভয় পেলে। মাসীমা বল্‌লেন, 'বৌমা, বাড়ীতে পুরাণ-পাঠ হ'ক, শুন্‌লে তোমার মন একটু ঠাণ্ডা হবে।' দাদা বল্‌লে, 'একটা অতিথ-শালা কর। একটা-কিছু নিয়ে ত থাক্‌তে হবে।' পোড়াকপাল! নাই বা থাক্‌লুম, দাদা! থাক্‌তে কে চায়?

হায়, এই কি আমার ভাগবত-পুরাণ শোন্‌বার বয়েস, না, অতিথ-ফকিরের সেবা কর্‌বার বয়েস? আমার যে এখন সুখের সংসার পাত্‌বার সময়। আমি কি এখন ও-সব নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌তে পারি? আমার যে এখন স্বামি-সেবা কর্‌বার সময়, সন্তান-পালন

করবার সময়। সে অপ্রাপ্ত দুর্লভ রত্নের জন্য যে, আমার মাতৃহৃদয় বেদনায় টন্‌টন্ করছে। সে অশ্রুত মাতৃ-সম্ভাষণের জন্য যে, আমার মায়ের প্রাণ উপসী। আমি কি এখন ভাগবত-পুরাণ নিয়ে থাকতে পারি? আমার কি নিয়ে-থাকবার মত জিনিস কিছু নাই?

আমার স্বামী আছেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না, কিন্তু আমার মনের ভিতর তিনি আছেন। একটী চাঁদপানা খোকা আছে। বড় দুঃখ রইল, আমারি সে সোনার যাদুকে কাউকে দেখাতে পারলুম না। দেখাতে পারলুম না, আমি মনে-মনে গ'ড়ে তা'কে কেমনটী করেছি। কিন্তু সে আর বেশী বড় হ'ল না। তা এই ছোট বয়েসেই সে যে দুরন্ত হয়েছে! এখনও ভাল ক'রে চলতে শেখেনি; তবু, হেলতে-দুলতে এসে, ফুলের কুঁড়ির মত ক'টী

খুদে-খুদে দাঁত বা'র ক'রে হেসে-হেসে, কখন আমার আঁচল,কখন হাঁটু জড়িয়ে ধরে। দুপুর-বেলা আমি যখন আমার পিণ্ডি রাঁধ্‌তে বসি, সে এসে আমার পিঠের ওপর পড়ে। দিন-রাত উৎপাত—কখন এটা ভাঙে, ওটা ফেলে দেয়। আমি তা'কে বুকে এঁটে ধ'রে, তা'র বাপের কাছে নিয়ে যাই; বলি—'হাঁগা, ছেলে এমন দুরন্ত হ'ল, আমায় যে একদণ্ড তিষ্ঠতে দেয় না, তুমি একটু বক্‌বে না?' তিনি কেবল হাসেন! সে-হাসি আমি বিভোর হ'য়ে দেখি! অমনি দাদা এসে বলে, 'তুই অমনি ক'রে ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্, আর ভাত চুঁইয়ে যাক।' দাদা, এমনি করেই কি সাধের ছবি ভেঙে দিতে হয়! হায়, এত ক'রে আঁক্‌লুম! দু'দণ্ড তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি ব'সে যে দু'ট কথা কইব, সব দিন সে সময়ও

পাই নি।' হয় ত সিধু-ঝি এসে বল্‌লে, 'মা, আমার একজন কুটুম্‌ এসেছে, তা'র সিধে বা'র্‌ ক'রে দাও।' অমনি যেতে হ'ল। কি করি, যাঁর সংসার, আমি যে তাঁর দাসী!

এমনি ক'রে আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। ক্রমে মাসীমাও আমায় ছেড়ে চ'লে গেলেন। আমি এই নির্বান্ধব-পুরীতে একলা কেমন ক'রে যে দিন কাটাব, সে কথা কেউ ভাবে না। কেউই দেখ্‌ছি, আমার মুখ চায় না! বাবা গেলেন, মা গেলেন; ইনি পায় ঠেল্‌লেন; মাসীমাও চ'লে গেলেন; আবার খোকাও বল্‌ছে—'মা, আমি খেল্‌তে যাব।' 'আমি কি নিয়ে থাক্‌ব, বাবা!' সে বল্‌লে, 'কেন? তুমি যখনই মনে কর্‌বে, আমায় দেখ্‌তে পাবে, আমার কথা শুন্‌তে পাবে।'

সত্য, সে ত মিথ্যা বলেনি! যখনই কেউ

এসে অন্ন চায়, আমার মনে হয়, ঐ যে আমার খোকার ক্ষিধে পেয়েছে! কেউ এসে বস্ত্র চায়, অমনি মনে হয়, আমারই খোকা কাপড় চাচ্ছে! ছুটে গিয়ে দেখি—এ ত আমার সে-ই! আমার সোনার যাদু, মাণিক আমার, আমার বুক-জুড়ন, নাড়ী-ছেঁড়া ধন! তুমি চির-জীবী হ'য়ে আমার কোল জোড়া ক'রে থাক। আমি বড় দুঃখিনী! আমার কেউ নেই, বাবা, কেউ নেই, আমি বড় অভাগিনী! আমার এ বিষয় কা'র জন্য? সবই ত আমার বংশের দুলাল ভোগ করবে ব'লে? অতিথ্-শালা কর, দাদা!

অতিথ্-শালা প্রস্তুত হ'ল—আমাদের খিড়কীর বাগানের পিছনে। সেখানে নিত্য অতিথি খায়, আর সময়-সময় সাধু-সন্ন্যাসী এসে থাকেন। এই অতিথি-শালায় একটী ঘরের মতন

আছে। কখনকখন ভাল সাধু-সন্ন্যাসী এলে সেইখানে ব'সে তাঁদের কাছে ধর্ম্মকথা শুনি। সবারই ঐ এক কথা! জপ-তপ, সাধন-ভজন কর, ভগবান্‌কে ডাকো! তাঁদের ভগবান্ কে? তাঁকে ত আমি চিনি নি। আমার যে একজন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত! তাঁকে আমি নিত্য ফুল পরাই, চন্দন মাখাই, আমার মনের কথা বলি। তাঁকে বৈ অন্য দেবতাকে ডাকতে আমার ভালই লাগে না, তা সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনব কি? কিন্তু তবু যাই। তাঁরা যখন ভজন গান করেন, বড় মিষ্টি লাগে। মনে হয়, এ ত আমারই ইষ্ট-দেবতার স্তব।

দিনেরবেলা একরকমে কেটে যায়। রাত্রিতে এ শূন্যপুরী বড়ই ভয়ঙ্কর মনে হয়। এ বাড়ী লোকজনে পরিপূর্ণ, কিন্তু তবু শূন্য!

যখন তিনি ছিলেন, একলাই সব পূর্ণ ক'রে থাকৃতেন। একের অভাবে সমস্ত বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ কর্ছে !

তাঁর সে-শয়নকক্ষ আমি দিনেরবেলা ঝাড়ি-ঝুড়ি, পরিষ্কার করি। রাত্রিতে সে-ঘরে যেতে পারি না। মনে করেছি, যখন আমার জীবনে মহারাত্রির উদয় হবে, তখন সেই ঘরে গিয়ে ঘুমুব। সে-ঘর যে আমার পরমতীর্থ, সেখানে ম'লে আমি সেই তীর্থেশ্বরকে পাব। রাত্রিতে হয় তাই ছাদে প'ড়ে কাটাই, নয়, আমাদের খিড়্কীর বাগানে গিয়ে একলাটী চুপক'রে ব'সে থাকি। সেখানে সাদা-কালো-পাথরের বাঁধান একটী বেদী আছে। তা'র চারিদিকে মল্লিকা, বেল, যুঁই, টগর, কুঁদফুলের ঝাড়—ফুলে ভ'রে রয়েছে। তাদের হাসি দেখ্‌লে আমার তাঁর হাসি মনে পড়ে। ফুলগুলি

স্পর্শ কর্‌লে আমি তাঁর স্নিগ্ধ স্পর্শ-সুখ অনুভব করি।

আজ সেইদিন। আমার বেশ মনে পড়্‌ছে, সে কোন্ যুগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম। আমি ক'নে-চন্দন, চেলী প'রে, কুসুমহারে সজ্জিত হ'য়ে, একখানি পীঁড়ির উপর ব'সে আছি। এক রাজপুত্তুর গিয়ে আমারি হাত ধ'রে এই বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি কোথায় চ'লে গেলেন, আর এলেন না। আমি কিন্তু সেইদিন হ'তে তাঁর প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।

মাথার উপরে কালো আকাশ—তা'তে কত নক্ষত্র! আমার মনে হয়, তা'রা যেন সব কতকাল ধ'রে আমার পানে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছে! আকাশ নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ, বাতাস নিথর, বৃক্ষসব নিস্পন্দ! যেন সব স্বপ্ন! কেবল আমি সত্য! কত যুগ-যুগান্তর ব'সে-

ব'সে এই স্বপ্নই দেখ্ছি। কত ভাঙ্ছে, কত গড়্ছে, কত আস্ছে, কত যাচ্ছে!—আমি কিন্তু নিয়তির নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির মত, চিত্রিত দুঃস্বপ্নের মত, চিরকাল এমনি ব'সে আছি। বুকের ভিতর কেমন ক'রে ওঠে! মুছে দাও, প্রভু! যেমন ক'রে আমার সিঁথের সিঁদূর মুছেছ, তেমনি ক'রে আমাকেও মুছে দাও!

আজও আমার চারদিকে তেমনি ফুল ফুটেছে, সেদিন যেমন ফুটেছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমায় একলা ফেলে সে স্বপ্নের রাজপুত্তুর গেল কোথায়! যাবার সময় ব'লে গিয়েছিল, 'সাবিত্রী যমালয় থেকে সত্যবান্কে ফিরিয়ে এনেছিলেন; যে পারে, তা'র কেরে।' কৈ, ফেরাতে ত পার্লুম না! হায়, আমি যে মনে করেছিলুম, তাঁর পায় কাঁটাটী ফুট্তে দেব না।

ঐ দিগন্তের আঁধারে যেমন একটীর পর আর একটী নক্ষত্র ফুট্‌ছে, আজ আমারও মনের অন্ধকারে তেমনি একটী-একটী ক'রে স্মৃতি উঠ্‌ছে! পথে আস্‌তে-আস্‌তে রাজপুত্রের সেই প্রথম-সম্ভাষণ—'তুমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী, না, মর্ত্তের ফুলরাণী!' এই বেদীর উপর ব'সে, আমার মুখের পানে চেয়ে, সেই গান—'জনম্-জনম্ হাম্ রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল!'

এ কি! স্বপ্নের রাজপুত্তুর ফিরে এল নাকি? না—আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, বৃক্ষপত্র সহসা মুখর হয়ে উঠে গাইছে—'জনম্-জনম্ হাম্ রূপ নেহারিনু—?'

এ-কি আমারই অন্তরের সুর বাইরে ধ্বনিত হচ্ছে? আমি কি পাগল হব? এ গান ত অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি। কিন্তু

ঐ স্বর, ঐ সুর যে, ফতেপুরের মাঠে চির-নীরব হ'য়ে গেছে! স্বর্গ হ'তে কি এ সুধার ধারা ব'য়ে আস্‌ছে? এ-কি অশরীরীর গান, না, স্বপ্নের রাজপুত্তুর সত্য-সত্যই ফিরে এল? এ দিকে কে আস্‌ছে!

আমি ভয়শূন্য। দেহীর চরম ভয় মৃত্যু, আমি তা'র প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু তবু আমার বুকের ভিতর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। আমি ভয়ে-ভয়ে আগন্তুককে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে তাঁর চেহারা ভাল দেখা গেল না।

কিন্তু তিনি, বোধ করি, আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বর সহসা থেমে গেল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'কে আপনি?'

'আমি সন্ন্যাসী। তুমি কে? স্বর্গের ইন্দ্রাণী, না, মর্ত্তের ফুলরাণী?'

একে সেই স্বর, সেই সুর, সেই গান, তা'র উপর আবার প্রথম-মিলনের সেই প্রথম-সম্ভাষণ! আমাতে যদি মূর্চ্ছা-যাবার মত কিছু উপকরণ অবশিষ্ট থাকৃত ত সংজ্ঞা হারাতুম। দু'হাতে জোর ক'রে বুক চেপে ধ'রে বল্‌লুম—'স্থির হও, স্থির হও, দাদা যে স্বহস্তে তাঁর সৎকার ক'রে এসেছে!'

আমার গা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগ্‌ল। আকাশের সমস্ত তারা, পৃথিবীর সব দৃশ্য যেন সহসা নিবে গেল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। ভাব্‌লুম, এ অতিথি যদি সত্যই লোকান্তর হ'তে এসে থাকেন, সে ত প্রার্থনীয়। আজ একুশ বৎসর ধ'রে যাঁর পূজা করছি, তিনি যদি সদয় হ'য়ে দেখা দেন, তা'র চেয়ে আর আমার সৌভাগ্য কি আছে?

পরদিন সকালে খবর পেলুম, সন্ন্যাসী

অতিথিশালায় আছেন। দাদা এসে বল্‌লে, 'একজন নূতন সন্ন্যাসী এসেছেন।'

'কোথা থেকে?'

'ফতেপুর থেকে।'

আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল! চকিতে দাদার মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লুম, আমার দৃষ্টির ব্যাকুলতা দেখে সে কি বুঝ্‌লে, বল্‌তে পারি না। আমি যে সন্ন্যাসীকে রাত্রিতে দেখেছি, সে ত জানে না। কিন্তু তা'র চোখ দেখে আমি বুঝ্‌লুম, তা'র দৃষ্টির আড়ালে কি যেন লুকানো রয়েছে। আমিও যে ভ্রমে পড়েছি, দাদাও সেই ভ্রমে পড়েছে।

দাদা বল্‌লে, 'সন্ন্যাসীকে দেখে পাগ্‌লা-মীর মত অনেক কথা আমার মনে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, আপনি এখন

কোথা থেকে আস্‌ছেন? সন্ন্যাসী বল্‌লেন, আপাততঃ ফতেপুর থেকে।'

আজ ক'দিন হ'ল, সন্ন্যাসী অতিথিশালায় আছেন। ঠিক একরকম মানুষ কি দু'জন হয়? আমি নিত্য সন্ন্যাসীকে দেখি। নিত্য তাঁর মুখে ধর্ম্মকথা শুনি। একদিন প্রশ্ন কর্‌লুম, 'স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কি?'

'স্ত্রীলোকের স্বামি-সেবাই ধর্ম্ম।'

'যদি বিধবা হয়?'

'মৃত-স্বামী কি স্বামী নয়?'

'সন্ন্যাসি, মৃত-স্বামীকে ইষ্টরূপে পূজা কর্‌লে তিনি কি সদয় হ'ন?'

'ভক্ত নিজের হাতে মাটী দিয়ে শিব গড়ে, প্রেম-ভক্তিভরে তাঁর পূজা করে; তারপর সেই নিজের হাতে-গড়া মাটীর শিবের কাছে মুক্তি চায়, মুক্তি পায়। প্রেমে পাষাণ প্রাণ

পায়, মৃত্তিকা সচেতন হয়, দারু কথা কয়!
প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়!'

'মৃত-পতির কি দেখা পাওয়া যায়? তিনি ফিরে আসেন?'

'সাবিত্রী যমালয় থেকে সত্যবান্‌কে ফিরিয়ে এনেছিলেন। যে পারে, তা'র ফেরে।'

সেই কথা!. যে-কথা ব'লে তিনি আমার কাছ থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়েছিলেন! —সেই কথা!

কে এ, কে এ সন্ন্যাসী? এর কণ্ঠস্বর শুন্‌লে কেন আমার আর একটী কণ্ঠস্বর মনে পড়ে? এর চাউনীতে কেন আর একজনের নয়ন-ভঙ্গী দেখ্‌তে পাই? এর হাসিতে কেন আর এক হাসির জ্যোৎস্না খেলে? এই প্রিয়দর্শন, সুঠাম, নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে কেন আমার আর একটি তরুণ, শ্যাম-সুন্দর

মূর্ত্তি মনে হয়? কে এ? কে এ সন্ন্যাসী? আজ এ-কে দেখে মরা-নদীতে আবার জোয়ার আসে কেন? এর দৃষ্টিতে যেন আমার চারিদিকে রাশি-রাশি ফুল ফুটে ওঠে! বুকের ভিতর সাধের সাগর তোল্‌পাড়্‌ কর্‌তে থাকে।— এ-কে দেখ্‌বার জন্য, এর কথা শোন্‌বার জন্য, কেন আমার চক্ষু-কর্ণ নিয়ত তৃষিত হ'য়ে থাকে? আমার যৌবন বিগত, মন আশাহত, প্রাণ মৃত, হৃদয় রসহীন, তবু এতদিন পরে কেন এ শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়? ইচ্ছা হয়, এই সন্ন্যাসীর পায় ধ'রে বলি, ওগো, তুমি আমায় কলঙ্কিনী ব'লে পায় ঠেলে গিয়েছিলে, আমি যে আমার একুশবছরের তৃষ্ণা নিয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। একি সেই! সত্যই সেই? মৃত কি ফিরে আসে?

দাদা একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'এ সন্ন্যাসীকে তোর কি মনে হয় ?'

আমি মনে-মনে বললুম—আমার যম !

সত্যই আমার যম ! আমার দু'দিকে দুই সাগর উথ্‌লে উঠ্‌ছে, তা'র মাঝখানে আমি অবলা—তৃণের বাঁধ—কতক্ষণ স্থির থাকব ? আমার একদিকে সন্দেহ, একদিকে আকর্ষণ ; একদিকে স্বর্গ, একদিকে নরক ; একদিকে তৃষ্ণা, একদিকে অমৃত ; আমি কতক্ষণ স্থির থাকব ? আমার একদিকে অবসাদ, একদিকে উচ্ছ্বাস ; একদিকে স্বপ্ন, একদিকে জাগরণ ; একদিকে জীবন, একদিকে মৃত্যু—তরঙ্গের পর তরঙ্গ বুক ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে—এ তরঙ্গের সংঘর্ষণে আমি কতক্ষণ টিক্‌ব ? তলিয়ে যাব, তলিয়ে যাব ! হে ঠাকুর ! হে আমার অন্তরের দেবতা ! ইহ-পরকালের সহায়,

এ আবার তোমার কি ছলনা? কি পরীক্ষা? একবার কলঙ্কিনী ভেবেছিলে, সেই পরীক্ষা আজ একুশ বৎসর ধ'রে দিচ্ছি। আবার এ-কি ছলনা? আমার প্রাণ বল্‌ছে—এই তুমি—ছুটে চল্! মন বল্‌ছে—ধর্ম্ম—ছুঁস্‌নি! এক-জন টান্‌ছে, একজন পায় বেড়ী দিচ্ছে! আমি অবলা, কত সইব? ধর্ম্মই আমার বল, তুমিই আমার বল।

মা গো, আজ অনেক দিনের পর তোমায় মনে পড়্‌ছে। তুমি আগুনে পুড়ে যন্ত্রণা এড়িয়েছ, আমি পুড়্‌ছি, পুড়্‌ছি! সেই-যে মা, ফেলে চ'লে গিয়েছিস্, আর কি কোলে নিবিনি? একবার, মা, আর একবার আমায় দেখা দে, কোলে নে, আমি তোর কোলে জুড়ুই! মা গো, এই যে শয্যা নিলুম, এই শয়ন যেন আমার শেষ শয়ন হয়!

মা, তুমি সতী! আমি যদি সতীর মেয়ে সতী হই, আর এ শয্যা থেকে উঠ্‌ব না!

আমি শয্যা গ্রহণ কর্‌লুম, ছল ক'রে নয়, সত্য। ঢেউ লেগে হঠাৎ যেমন নদীর কূল ভেঙে পড়ে, আমার শরীরও তেমনি ভেঙে পড়্‌ল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মাটী যেমন জলে মিলিয়ে যায়, আমার জীবনও তেমনি মৃত্যু-সাগরে মিশাতে লাগ্‌ল!

দাদা কবিরাজ ডাক্‌লে। সে এসে নাড়ী টিপ্‌লে, বড়ি দিলে, কিন্তু ঘাড় নাড়্‌তে-নাড়্‌তে চ'লে গেল। আমি বুঝ্‌লুম, আমার যন্ত্রণা শেষ হ'য়ে এসেছে।

দাদা জোর ক'রে কিছুদিন সে বড়ি আমায় খাওয়ালে। কিন্তু আমি জানি—যে, তা'তে কোন ফল হবে না! এতদিন পরে মাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। মা বলেছেন,

সব সতীকেই আগুনে পুড়্তে হয়। কেউ ধূ-ধূ ক'রে জ্বলে যায়, কেউ গুমে-গুমে পোড়ে। তোর চিতা নেব্বার সময় হয়েছে।

যদি তিনি ফিরে এসে থাকেন, হায়, আমি কি এমনি ক'রে ফিরে আস্তে বলে-ছিলুম! এমনি স্বপ্নের মত, ধোঁয়ার মত, রহস্যের মত, কুহকের মত!—কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখ্ব, ধর্তে-ছুঁতে পাব না।

একদিন দাদা আমায় ওষুধ খাওয়াতে এলে, বল্লুম, 'দাদা, ওষুধ ত এতদিন খেলুম, কোন ফল ত হ'ল না।' সে চোখ মুছ্তে লাগ্ল। তারপর জিজ্ঞাসা কর্লুম, 'দাদা, সন্ন্যাসী কি চ'লে গেছেন?—না? হাঁ দাদা, সন্ন্যাসীদের কারুর-কারুর কাছে অনেক রকম মহৌষধ থাকে না?'

দাদা অমনি বিছানা থেকে লাফিয়ে

উঠ্‌ল ; বল্‌লে, 'আমি কী বাঁদর ! এ সোজা কথাটা এতদিন মনে করিনি। আমি এখনই তাঁকে ডেকে আনি।'

'আজ নয়, দাদা, আজ নয় ! আমি যখন বল্‌ব, তখন।'

সন্ন্যাসীর কাহিনী

শকুন্তলা-লালিত হরিণ-শিশুর মত, বোধ করি, আমি আজন্ম আশ্রম-পালিত। আমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, কাহাকেও মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে, একখানি বিষণ্ণ মুখ ও দুইটী কাতর চক্ষু। সে-মুখ আমি দিবসে ধ্যান করি, নিশাতে স্বপ্নে দেখি।

কে তুমি গো কল্পলোক-বাসিনী, মানস-মোহিনী! কোন্ তপলোক হ'তে এসে উদাসীর হৃদয় আবিষ্ট করেছ? কোন্ স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে এসে আমায় মোহের মত আচ্ছন্ন করেছ? কে তুমি? কোথায় তোমায় দেখেছি?

শুনেছি, মাতা-পিতা নির্ম্মম হ'য়ে আমায় নদীনীরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ছয়-মাসের শিশুকে সহস্র-কবল তরঙ্গ গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল, এক সাধু আমায় তা'র লুব্ধ গ্রাস হ'তে কেড়ে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করেন। সংসারের কোন স্মৃতি ত আমার নাই। তুমি তবে স্মৃতির কোন্ দেশ থেকে এসে আমায় মুগ্ধ করেছ? তোমার ঐ মুখ দেখে কেন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে লালসার সহস্র-শিখা জ্ব'লে উঠে? মনের মধ্যে যেন বসন্ত-রাগিণী ঝঙ্কার দেয়! সে কি তোমার আহ্বান-ধ্বনি?

যিনি আমায় লালন-পালন করেছেন, তিনি একজন অলৌকিকসাধনশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। যেদিন তিনি আমায় ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করেন, সেদিন বলেছিলেন যে, নারী-

চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আমি সে মুখখানি মন হ'তে দূর করিতে যতই যত্ন করিতে লাগিলাম, ততই তাহা আমায় আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সাধুকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমায় একটী প্রক্রিয়া বলিয়া দিব, তাহা সাধন করিলে তুমি জানিতে পারিবে, এই রমণীমুখ তোমার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, কি এ-জন্মেই তোমার শৈশবে কেহ তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।'

'পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ?'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আশ্চর্য্য কি ? জীবন-নাট্যের উপর মৃত্যুর যবনিকাপাত হইলে, সমস্তই শেষ হয় না। সংস্কার যেমন থাকে, স্মৃতিও তেমনি থাকে। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান এখনও এ তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

কালে জানিবে যে, দেহনাশের পর পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি সুপ্ত থাকে মাত্র, লুপ্ত হয় না। কেবল তাহাই নয়। অন্তর্জ্জগতের কথা ত স্বতন্ত্র, জড়-জগতে কথন-কথন দেখা যায়, একই আকৃতি পুনঃপুনঃ প্রকটিত হয়। আমি এক মৃতবৎসা জননীর কথা জানি, বারংবার একই চেহারার মৃতশিশু প্রসব করিতেন। তিন-চারিবার প্রসবের পর, শিশুর একটী অঙ্গচ্ছেদ ক'রে দেওয়া হয়। পর-বার সেইরূপ বিকলাঙ্গ শিশুই প্রসূত হয়েছিল। ইচ্ছাময়ী প্রকৃতির অনন্ত শক্তি, অচিন্ত্য লীলা!

আমি সে অদ্ভুত সাধনায় ব্রতী হইলাম।

দীর্ঘকাল আশা-নিরাশার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ঘোর কাটিল। তারপর অন্ধকারে উষারাগ দেখা দিল। অবশেষে সুস্পষ্ট দিবা-লোকে আমি চিনিলাম, সে বিষণ্ণ মুখ আমার

পূর্ব্বজন্মের স্ত্রীর। উঃ, কি নিদারুণ ঘটনা! কলঙ্কিনী বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করি। তারপর সিপাহী-বিদ্রোহে ফতেপুরে প্রাণবিসর্জ্জন দি। মৃত্যুকালে তা'র বিষণ্ণ মুখ ধ্যান করিতে-করিতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে দেখিতে পাই এবং সে আমাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা করে।

পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানলাভ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। কি-এক অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে টানিতে লাগিল।

শুনিয়াছি, মানুষ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব-কর্ম্মভূমির উপর তাহার প্রবল আকর্ষণ হয়। বিশেষতঃ যেখানে সে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল, সে-স্থান তাহাকে মোহাবিষ্টের ন্যায় আকর্ষণ করে। আমি জীবন্ত প্রেতের মত ফতেপুরে চলিলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, যে-স্থান একদিন নররক্তে প্লাবিত হইয়াছিল, সেখানে এখন একখানি রমণীয় উদ্যান-ভবন শোভা পাইতেছে। যেখানে আমার সৎকার হইয়াছিল, সেখানে একটী কাঁটা-ঝাউগাছ সরল, সতেজ ভাবে উঠিয়াছে। হায়, আমার পূর্ব্ব-জীবনের এই পরিণাম! একটীও ফুল নাই, ফল নাই, কেবল কণ্টক!

আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, সহসা উদ্যান-বাটীর ভিতরে যেন আমার গত জীবনটাকে শ্লেষ করিয়া একটা কলহাস্য উঠিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। মৃত্যুর রঙ্গভূমে এই আনন্দের হাট! মানুষ এমনি আত্মবিস্মৃত! মাথার উপর শূন্য, পদতলে শ্মশান, মাঝখানে তা'র সুখের বাসর, সহচর শমন! আমিও এই শ্মশানে একদিন খেলাঘর বাঁধিয়াছিলাম।

যে আমার ক্রীড়ার সঙ্গিনী ছিল, যার সেই বিষণ্ণ মুখ মৃত্যুঞ্জয় হইয়া এখনও আমার মনে জাগিয়া আছে, সে এখন কোথা? জীবিত কি মৃত? হয় ত এখনও সে সেই খেলাঘর আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে! কোথায় সে? কোথায় সে? ক্রমে আমার পূর্ব্বজন্মস্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সেখানেও কী পরিবর্ত্তন! যাহাদের মায়ের কোলে দেখিয়া গিয়াছি, তাহারা এখন ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাহাদের ঘনকৃষ্ণ কেশ ছিল, তাহাদের কাহারও মাথায় টাক, কাহারও মাথায় দুধের মত পাকাচুল। যেখানে মাঠ ছিল, সেখানে হাট বসিয়াছে। যেখানে স্মৃতিরত্নের টোল ছিল, সেখানে একখানি চটীর দোকান হইয়াছে! দেখিতে-দেখিতে আমাদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

সদর-দরজাতেই আমার সেই চোর-সম্বন্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বোধ হয়, আমার আকৃতিতে সে আমার পূর্ব্ব-চেহারার কিছু বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়াছিল, তাই হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায়, এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌তে পারি কি?'

আমার স্বর শুনিয়া সে বসিয়া পড়িল।

আমি বলিলাম, 'আপনি ব'সে পড়্‌লেন যে? বোধ করি, খুব অসঙ্গত প্রার্থনা করেছি?'

সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'না, না, কিচ্ছু অসঙ্গত নয়। আমার ভগ্নীর অতিথ-শালা আছে। কিছুক্ষণ কেন, যতদিন ইচ্ছা থাকৃতে পারেন।'

সে জীবিত কি না জানিবার এই ত

সুযোগ। বলিলাম, 'তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসুন। সুবিধা পেলে এখানে কিছুদিন থাক্‌বার প্রার্থনা করি।'

সম্বন্ধী বলিল, 'তা'র আর অনুমতি নিতে হবে না। আমিই এখানকার কর্ত্তা। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন।'

সে এখনও ইহলোকে আছে শুনিয়া মন ভারি প্রফুল্ল হইল। সম্বন্ধীর সঙ্গে একটু হাসি-তামাসা আরম্ভ করিয়া বলিলাম, 'তবে, মশায়, গোড়ায় অত ভাব্‌ছিলেন কি?'

'সে-কথা ভাবিনি। ভাব্‌ছিলুম, আপনার ত এই বিশ বাইশ বছর বয়েস, এই কাঁচা-বয়েসে আপনি গেরুয়া নিয়েছেন কি দুঃখে?'

আমি বলিলাম, 'একটা-কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে? আপনি অতিথ-শালা নিয়ে আছেন—তাই, নইলে, হয় দেশহিতৈষী হ'তে

হ'ত, আর নয়, কেবল নিঃস্বার্থ পরোপকার ক'রে বেড়াতেন।'

দেশ-হিতৈষিতা, নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা বলিয়া সে-ই আমায় ফতেপুরে ঠাট্টা করিয়াছিল। একে পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে আমার আকৃতির সাদৃশ্য, ত'ার উপর আবার কথাগুলোও সেই। ' সম্বন্ধী আবার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, 'মশায়, আপনি থাক্‌ছেন-থাক্‌ছেন, অমন ক'রে ব'সে-ব'সে পড়্‌ছেন কেন? ঘূর্ণী-রোগ আছে নাকি?'

সম্বন্ধী হাঁ-না কিছুই না-বলিয়া, বিস্ময়ে আমার মুখ-চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি এখন কোথা থেকে আস্‌ছেন?'

'আপাততঃ ফতেপুর থেকে। ও কি মশায়, এবার যে একেবারে জমী-নোবার

যোগাড়! কাঁচা-বয়সে গেরুয়া নেওয়া না-হয় অপরাধ, বাইশ-বছরে ফতেপুর থেকে আসাও অপরাধ হ'ল না কি? বলেন ত না-হয় ফিরে যাই।'

সে সে-কথারও কোন উত্তর দিল না। আমার হাত ধরিয়া অতিথি-শালার দিকে লইয়া যাইতে-যাইতে বলিল, 'আপনার নাম কি?'

হাত ধরিবার অভিপ্রায় আমি বুঝিলাম। তাহার দেখা উদ্দেশ্য, আমার দেহটা শুধু হাওয়ার—না পাঞ্চভৌতিক। আমি উত্তর দিলাম, 'সন্ন্যাসীর নাম নাই, তবে যদি নেহাৎ আপনার দরকার হয়, আমায় ভূতানন্দ ব'লে ডাক্‌তে পারেন।'

নামটা শুনিয়া সঙ্গী সহসা শিহরিয়া উঠিল! তা'র পা যেন আর চলিতে চায় না! বোধ হয় ভাবিয়াছিল, আমার সঙ্গে

নিরিবিলি আলাপ নিরাপদ নহে। সে-কথা বুঝিয়াও না-বুঝিবার মত ভান করিয়া আমি বলিলাম, 'মশাই মনে করেছেন বুঝি এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছি গাঁজা-গুলির প্রলোভনে? তাই অমন কটমট্ ক'রে চেয়ে আমার ভাব বুঝ্ছেন? ভাব্ছেন, গাঁজা-গুলির চেষ্টায় এখানে এয়েছি? ভয় নেই, আমার সে-সব বালাই কিছু নেই। তবে ফতেপুরে একবার গুলি খেয়েছিলুম বটে—তা সে একেবারে সাংঘাতিক রকমের!'

আমার কথা শুনিয়া তা'র মুখ একেবারে ছাই হইয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, 'তাই ত!' তারপর আপন-মনে বিড়্বিড়্ করিতে লাগিল, 'কখন না! হতেই পারে না! আমি আপন-হাতে—'

সম্বন্ধীর কথা শেষ না-হইতেই আমিও

আপন-মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'সংসারের নিয়মই এই, কখন অগ্নি-সৎকার, কখন অতিথি-সৎকার।'

সম্বন্ধী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'আপনি ভূত মানেন?'

'বিলক্ষণ! ভূত মানি না? ভূত না-হ'লে এলুম্ কি ক'রে?'

ভয়ে শিহরিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, 'রাম-রাম! আমি কি সেই কথা বল্‌ছি?'

বুঝিলাম, রাম-নাম শুনিলে ভূত পলায়, সম্বন্ধী তাই ছলে-কৌশলে রাম-নাম করিতেছে। এ ভূত ত পলাইবার নয়! ভূত বলিল, 'রাম-রাম! আমিও ত তা-ই বল্‌ছি। পাঁচভূত নিয়ে এয়েছি, পাঁচভূত নিয়ে রয়েছি।'

সন্ধ্যার পর তাহার সহিত গল্প করিতে-

করিতে জানিলাম, এ সংসারে তিনটী বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি মরিয়াছি; আমার মাতৃস্বরূপিণী মাসীমার লোকান্তর হইয়াছে; আর আমার স্ত্রী তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেব-সেবা ও অতিথি সেবায় দান করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে।

এখন যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, তাহার দেখা পাই কিরূপে? যে অন্তঃপুর-রাজ্য আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছি, সেখানে ত ইহাদের অনুমতি ব্যতীত আমার প্রবেশাধিকার নাই! কোথায় তাহাকে পাইব?

ক্রমে রাত্রি হইল। আমার আহারাদি শেষ হইলে সম্বন্ধী শয়ন করিতে গেলেন। ক্রমে অতিথি-শালা নিস্তব্ধ হইল। আমি গ্রামখানি পরিদর্শন করিবার মানসে বাহির হইলাম।

অগ্রে আমার সেই অন্তঃপুরের উদ্যান-খানি দেখিবার সাধ হইল। এতরাত্রে বোধ হয়, সেখানে কেহ নাই। আস্তে-আস্তে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম।

বাগানের বৃক্ষসকল আমাকে পরিচিত বন্ধুর মত আদরে আহ্বান করিয়া লইল। রাত্রি ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র উঠিয়াছে। গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। কি সুন্দর! এ-সৌন্দর্য্য কত-বার দেখিয়াছি। যে-চক্ষুতে দেখিয়াছি, সে-চক্ষু এখন নাই। নূতন চক্ষু পাইয়াছি। সেই নূতন চক্ষুতে দেখিতেছি,—কি সুন্দর! আমি বিভোর হৃদয়ে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাইলাম—'জনম্-জনম্ হাম্ রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল!'

যে-বেদীতে বসিয়া, আমার স্ত্রীর মুখ-

পানে চাহিয়া এই গীতটী গাহিতাম, অজ্ঞাত-সারে আমার পদ সেই দিকে চলিল। কিছু-দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, বেদীর উপরে —সে-ই!—নিস্তব্ধ যামিনীর নীরব, নিথর প্রতিমূর্ত্তির মত একাকিনী বসিয়া আছে। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া বলি, ওগো, তুমি যার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছ, আমি সে-ই। ইচ্ছা হইল, এই দেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বলি, ওগো, আমি এসেছি, এসেছি, জীবনের পারে মৃত্যুর দেশ থেকে নবজীবন নিয়ে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি।

সে আমায় দেখিল। ভয়-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আপনি কে?'

'আমি সন্ন্যাসী। তুমি কে? এ ঘোর রাত্রিতে একাকিনী ফুলবনে? তুমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী, না, মর্ত্তের ফুলরাণী?'

সে-জীবনে ইহাই তাহাকে আমার প্রথম-সম্ভাষণ। এ জীবনেও তা-ই। আজিও যে আবার আমাদের প্রথম-মিলন। কিন্তু আমার প্রশ্নে সে যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল! ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া বক্ষে তুলিয়া লই। তখনই মনে হইল, আমি যে সন্ন্যাসী। এ সুধা আমার জন্য নয়। আমি ব্রহ্মচারী আর এ-ও যে ব্রহ্মচারিণী। আমার স্ত্রী যে বিধবা! আমাদের মাঝে যে মৃত্যুর নিষ্ঠুর ব্যবধান! এই মৃত্যু-নদীর দুই কূলে দু'জনে দাঁড়াইয়া, পরস্পরকে কেবল দেখিব! এ চক্রবাক্-মিথুনের বিচ্ছেদ-যামিনী পোহাবে না, পোহাবে না, আর পোহাবে না! হায়, সাধনায় পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়াছি কি এই জন্য? যত্ন ক'রে গরল কিনেছি, তপস্যায় বরের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত যাচ্ঞা করেছি! ধিক্!

বিধাতা মঙ্গলময়, করুণাধার—তাই মহানিদ্রার অন্তে নব-জাগরণে আর পূর্ব্বস্মৃতির উদ্বোধন হয় না! ছুটিয়া অতিথ-শালায় চলিয়া গেলাম।

হায়, আমার স্ত্রী এখন পরের কুলবধূ! নিত্য সে অতিথ-শালায় আসে। নিত্য সেই বিষণ্ণ মুখ, নৈরাশ্য-কাতর নয়ন দেখিতে পাই। নিত্য তা'র নয়ন নীরবে আমাকে কত প্রশ্ন করে। সে কাতর চক্ষুর অন্তরালে কি প্রেম, কি পিপাসা! কি নিদারুণ, করুণ কাহিনী লিখিত! এই নীরব-শোক-পরায়ণা নারী—ইহার মর্ম্ম-কথার শ্রোতা নাই, ব্যথার ব্যথী নাই—এই জনপূর্ণ পুরীতে আপনার মূক দুঃখভার লইয়া একাকিনী বসিয়া আছে! হায়, কেন হেথা আসিলাম, কেন ইহাকে দেখিলাম, কেন দেখা দিলাম! কেবল দহিব, দগ্ধ করিব বলিয়া? মনে হয়, ছুটিয়া পলাই,

কিন্তু পারি না। 'নারীচিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।'—হায়, গুরুদেব! আজন্ম সন্ন্যাসী—তুমি ত জান না, এ-চিন্তায় কত বিষ, কত মধু!

আজ কয়দিন হইতে আর তাহাকে দেখিতে পাই না। কেন? আমি সন্ন্যাসী, নারী-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার আমার নাই! যে আমার জীবনের জীবন, যার জন্য আমার জীবন-ধারণ, যার জন্য মৃত্যুর ব্যূহ ভেদ ক'রে এসে অসম্ভব সম্ভব করেছি, সে কেমন আছে, এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার নাই। আমার স্ত্রী হইলেও সে যে আর আমার নয়। আমার জীবন-ধারণে যে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সন্ন্যাসীর নারীচিন্তা যে পাপ!

পাপ? প্রেম—কলুষ? যে-প্রেমে শঙ্কর

উদাসী, গোলোকপতি গোপিনী-পিয়াসী, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সন্ন্যাসী, সে-প্রেম—কলুষ? যে-প্রেমে হর-গৌরী কায়-কায় মিলিত, বিশ্ব বলয়িত, সংসার-শৃঙ্খলিত; যে-প্রেম শিবের সাধনা, হরির কামনা, যোগীর আকিঞ্চন, ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণ, অদ্বৈতের তত্ত্ব, সে-প্রেম—কলুষ? যে-প্রেমে কুৎসিত সুন্দর, যে-প্রেম পরমানন্দের নির্ঝর, সে-প্রেম—কলুষ? হায়, গুরুদেব! হায়, গুরুদেব!

আরও কয়েকদিন তাহার কোন সংবাদই পাইলাম না। মন নিরতিশয় ব্যাকুল। আমার সঙ্গী চকিতের ন্যায় আসে, আবার চলিয়া যায়। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন সে কি বলিতে চায়, বলিতে পারে না। আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে

পারি না। আগ্নেয়গিরির মত আপনার অন্তর্দ্দাহ লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, এখানে থাকাও মুস্কিল, যাওয়াও দায়।

এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। তারপর একদিন অপরাহ্নে সম্বন্ধী আমায় বলিল, তা'র ভগ্নীর সাজ্ঘাতিক পীড়া, আমায় দেখিতে চাহিয়াছে। সন্ন্যাসীর পুণ্য-দর্শনে যে পাপ-ক্ষয় হয়!

সামান্য সভ্যতার যাহা প্রয়োজন, একজন পথ-প্রদর্শক হইয়া লইয়া যাওয়া, আমি তাহারও অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এই কি আমার সভ্যতার সম্মান করিবার সময়? একেবারে ছুটিয়া গিয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম—বাইশ বৎসর পরে!

কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমাদের সেই বাসরশয্যায় সে অন্তিম-শয্যা পাতিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই তা'র চোখে-মুখে কি-এক দিব্যালোক ফুটিয়া উঠিল! নিকটে আসন ছিল, আমায় বসিতে ইঙ্গিত করিল। আমি বসিলাম। তাহার কাছে একখানি ছবি ছিল—আমারই ছবি—সঙ্গোপনে সে বারবার সেই ছবি ও আমাকে দেখিতে লাগিল।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সে ঘর আমি যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, ঠিক তেমনিই আছে! আমার কোঁচান-চাদরখানি, জামাটী তেমনি আন্‌লায় ঝুলিতেছে। ছড়িগাছটী ঘরের এক কোণে আমার করস্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে। কেবল আমার চটীজোড়াটী চন্দন-কুসুম-চর্চ্চিত হ'য়ে একটী সজ্জিত আসন অধিকার করিয়াছে। ঐ সেই বালারুণবরণা জগদ্ধাত্রীর পট। সীতার অগ্নিপরীক্ষা। সাবিত্রী-

অঙ্কে সত্যবান্ শায়িত—প্রাণ-ভিক্ষার্থে শমন সন্তর্পিত-পদে আগুয়ান। আর ঐ সেই সেতার —হায়, চির-নীরব!—যার তারে-তারে বাজিত —'জনম্-জনম্ হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' সকলই তা'ই আছে, কেবল আমি মরিয়াছি, আর মরিতে চলিয়াছে আমার স্বর্গের ইন্দ্রাণী, মর্ত্তের ফুলরাণী। ঐ সেই ছিন্ন হার—দেওয়ালে লম্বমান। ফুলের পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া গিয়াছে, কেবল শুষ্ক বৃন্ত ও সূত্র ঝুলিতেছে, আমাদেরই প্রণয়-হারের মত! দেখিয়া আমার অন্তস্তল মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। সহসা বলিয়া ফেলিলাম, 'হায়, এ ছিন্নহার আর জোড়া লাগ্‌বে না।' আমার কথা শুনিয়াই শয্যা-শায়িনী চমকিত হইয়া কাতর-কুতূহল-নেত্রে আমার পানে চাহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ

কাঁপিতে লাগিল। অতি সামান্য উত্তেজনাও এখন আর তাহার সহ্য হয় না।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে অতি ক্ষীণ, কাতর-কণ্ঠে, ধীরে-ধীরে বলিল, 'সন্ন্যাসি, তোমাকে অনেক দিন থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-করি ক'রে কর্‌তে পারি নি। এখন না-জিজ্ঞাসা কর্‌লে আর সময় পাব না। আমার দিন ফুরিয়েছে। সন্ন্যাসি, তুমি কে?'

বলিবার দিন আমিও ত আর পাইব না। যে-ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি, আজ না-চাহিলে আর ত চাওয়া হইবে না। সে আমায় নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিল, 'সন্ন্যাসি, আমি সামান্য কৌতূহলে এ-কথা জিজ্ঞাসা করি নি। তোমার উত্তরের উপর আমার ইহকাল-পরকাল নির্ভর কর্‌ছে। সন্ন্যাসি, তুমি কে? তুমি কি চির-দিনই এমনি সন্ন্যাসী?'

কক্ষে কেহ ছিল না। তথাপি আমি চারি-দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, 'না। একদিন আমারও এমনি গৃহ ছিল। বাপ, মা, মাসী ছিল।'

'তোমার স্ত্রী ছিল না?'—'আছে।'

'বেঁচে আছে?'—'আছে।'

'তবে তুমি সন্ন্যাসী কেন?'

'আমি তা'রই জন্য সন্ন্যাসী।'

সে অতি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, কেন?' আমি বলিলাম, 'তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমার শরীর দুর্ব্বল। আমি তোমায় সব কথা বল্‌ছি। বল্‌তেই এসেছি। আমার স্ত্রীকে আমি কলঙ্কিনী মনে ক'রে ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম।'

সে যেন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না—উঠিতে চায়। আমি বলিলাম, 'তুমি স্থির হও, নইলে ভূমি যাবে। সব কথা

শোনা হবে না। একদিন আমার স্ত্রীর কাছে আমাদের বাগানে তা'র ভাই দাঁড়িয়েছিল; আমি তা'কে দেখে ভুল বুঝেছিলুম।'

'তারপর, তারপর? বল, বল।'

'স্থির হও, সতীর গর্ভে যার জন্ম, সেই সতীকে আমি ভুল বুঝে, অসতী মনে ক'রে বিবাগী হ'য়ে যাই। তারপর ফতেপুরে সিপাহী-বিদ্রোহে আমি আহত হই।'

'তারপর কি হ'ল?'

'তারপর সেই 'মুমূর্ষু'-অবস্থায় আমার স্ত্রীর ভা'য়ের সঙ্গে দেখা হয়। তা'র কথায় আমার সব ভুল ভেঙে গেল। আমি স্ত্রীর ছবি ধ্যান করতে-করতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, এ জীবনে কেবল ব্যথা দিয়ে গেলুম, ব্যথা নিয়ে গেলুম; আবার ফিরে এসে যেন তা'কে দেখ্‌তে পাই তা'র কাছে মার্জ্জনা

চাইতে পারি, তাই এসেছি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। যে-ভুল করেছিলুম, প্রাণ দিয়ে তা'র প্রায়শ্চিত্ত করেছি। এখন কি মার্জ্জনা কর্‌বে না? তোমার ঋণে মুক্ত না-হ'লে আমার মুক্তি নেই। কে জানে, কোন্ জন্মে, কোন্ স্রোতে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলুম। স্রোতের তৃণ মেলে, আবার বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। জানি না, কবে, কোথায়, কি-ভাবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে! নিষ্ফলে একটা জীবন দিয়েছি, প্রেমতৃষ্ণা মেটেনি। এ-জীবনও বিফলে গেল!'

আমার এ তৃষ্ণা নিয়ে কি জন্ম-জন্ম ফির্‌ব? হায়, কোথায় সে অমৃত-সিন্ধু, যার বিন্দুপানে সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়! হায় গুরুদেব, হায় গুরুদেব!

'সতি, তোমায় ত্যাগ ক'রে আমি চ'লে গিয়েছিলুম। প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়, সেই প্রেমে আবার আমায় তুমি বেঁধে এনেছ! এনে আমায় ফেলে চল্‌লে। এক জীবন তুমি আমার চিন্তায় কাটিয়েছ, এ-জীবন আমি তোমার প্রেম ধ্যান ক'রে কাটাব। আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু তোমার শিক্ষিত প্রেম আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা।'—বলিতে-বলিতে তাহার শীর্ণ হাতখানি ধরিবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! তুমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রহ্মচারিণী। এ-সব কথা তোমায় বল্‌তে নেই, আমায় শুন্‌তে নেই। ভগবান্ দয়াময়, একুশ বছরের যন্ত্রণা আজ আমার সার্থক হ'ল। দেহ যায়, স্নেহ বিফল হয় না; প্রাণ যায়, প্রেম নিষ্ফল হয় না—হারাণ-রত্ন কুড়িয়ে

পায়। সতীর জন্ম-জন্ম এক পতি। তিনিই ভূলোক-দ্যুলোক-গোলোকপতি। সন্ন্যাসি, আমি চিনেছি, তুমি সে-ই! ঐ দেখ, সন্ন্যাসি, মা এসেছেন সতীলোক থেকে আমায় নিতে। আর ত দেরি করতে পারি নি। তোমার সঙ্গে কথা শেষ হ'ল না। কথা ফুরুবার নয়, সাধ মেটবার নয়। আমি যাই, তুমি এস, এখানে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলুম, সেখানেও তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। তুমি এস। আর বিচ্ছেদ হবে না। মা বলেছেন, আর বিচ্ছেদ হবে না। কি আনন্দ! মুক্তি, মুক্তি, যন্ত্রণার কারাগার থেকে আজ আমার চিরমুক্তি! সন্ন্যাসি, তোমার এ কী রূপ! মরি-মরি, তুমি এত সুন্দর! এমন রূপ ত তোমার কখন দেখি নি! এ কী দিব্য-জ্যোতি তোমার মুখে! তোমার সর্ব্বাঙ্গে কিরণ

ঠিক্‌রে পড়্‌ছে ! সন্ন্যাসি, আর আমায় পায় ঠেল না। সন্ন্যাসি—'

হায়, মুখের কথা মুখেই রহিল, শেষ হইল না ! প্রাণশূন্য প্রতিমা আমার পদমূলে লুটাইয়া পড়িল !

সহসা যেন কত অজ্ঞাত কুসুম-সৌরভে কক্ষ আমোদিত হইল ! আমি চকিত হইয়া শুনিলাম, যেন সেই ছিন্নতার সেতার এতদিন পরে আবার বাজিতেছে ! সেই দিব্য সৌরভ, দিব্য সঙ্গীতের সঙ্গে-সঙ্গে আমার সীমন্তিনী সতী-লোকে চলিয়া গেল ! কেবল সেই ছিন্ন-হার, আর সেই ছিন্ন-তার সেতার ভূতলে পড়িয়া রহিল ! হায় গুরুদেব ! হায় গুরুদেব !

সম্পূর্ণ
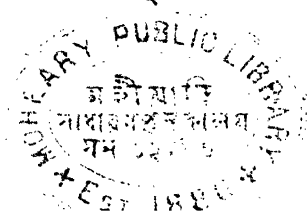
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দুর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না; নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

১। অভাগী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ

৩। পল্লী-সমাজ (৩য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—ইহার পরতে পরতে হিন্দুত্বের ভাব জমাট আছে।

বিপিনচন্দ্র পাল—চরিত্রগুলি অধিকাংশই সজীব ও বস্তুতন্ত্র।

সার্ গুরুদাস—এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে একটি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।

Sir A. T. Mukherjee—The author is evidently a gifted writer.

Sir A. Chowdhury—I have nothing but praise for it.

Amrita Bazar—The stories are replete with dramatic situations.

Bengalee—The stories abound in pathos of a rare order.